রূপসজ্জা

নিউ-লিট পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১নং কলেজ রো, কলিকাতা-৯

নিউ-লিট পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীসরলকুমার দত্ত কর্তৃক
২১৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীপ্রসূন বসু
কর্তৃক আগামী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৫৭, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

প্রথম প্রকাশ ১লা আষাঢ়, ১৩৬৬

প্রচ্ছদপট শিল্পী
গণেশ বসু

দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শ্রীশিবনারায়ণ রায়

প্রীতিভাজনেষু

রূপসজ্জা
দ্বৈত
দুই লেখক
পাত্রী
পুরাতনী

লেখকের অন্যান্য বই

অসমতল, হলদে বাড়ি, দ্বীপপুঞ্জ, উল্টোরথ, পতাকা, অক্ষরে অক্ষরে, চড়াই উৎরাই, দেহমন, দূরভাষিণী, শ্রেষ্ঠ গল্প, সঙ্গিনী, গোধূলি, চেনামহল, কাঠগোলাপ, অসবর্ণা, ধূপকাঠি, মলাটের রঙ, অনুরাগিণী, রুপালী রেখা, দীপান্বিতা, নিরিবিলি, ওপাশের দরজা, একূল ওকূল, বসন্ত পঞ্চম, শুক্লপক্ষ, কন্যাকুমারী, মিশ্ররাগ, উত্তরণ, অনমিতা, সুখদুঃখের ঢেউ, পূর্বতনী, কথা কও, অঙ্গীকার।

রূপসজ্জা

বীরনগর কলোনীর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সভাপতি হয়ে এসেছেন প্রবীণ নাট্যকার ও অভিনেতা হরিবিলাস রায়। সভায় তিনি আধঘণ্টা সভাপতিত্ব করবেন, এই চুক্তিতে দুই পক্ষেরই সম্মতি ছিল। কিন্তু উদ্যোক্তাদের রকম-সকম দেখে হরিবিলাস ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়তে লাগলেন। আধ ঘণ্টা তো ভালো, আড়াই ঘণ্টাতেও মুক্তি মিলবে কিনা সন্দেহ। নতুন স্কুল বাড়ীর সামনে বিস্তীর্ণ কম্পাউণ্ড জুড়ে প্রথমে সারি সারি ফোল্ডিং চেয়ার, তারপর ঘাসের উপর শতরঞ্জি বিছান হয়েছে। কিন্তু শ্রোতাদের দেখা নেই। উঁচুনিচু সবগুলি আসন শূন্য। সভাপতিকে দর্শন এবং তাঁর ভাষণ শ্রবণের জন্যে কারও যে কিছুমাত্র আগ্রহ আছে তার পরিচয় না পেয়ে হরিবিলাস মনে মনে বিরক্ত আর ক্ষুণ্ণ হতে লাগলেন। এখানে ওখানে ছেলেরা জটলা পাকাচ্ছে, নিজেদের মধ্যে কি সব কথাবার্তা বলছে, কিন্তু সভার কাজ আরম্ভ করবার কোন লক্ষণ নেই।

রঙিন কাপড়ে ঘেরা মঞ্চের ওপর খান কয়েক চেয়ার, তার সামনে ফুলদানি শোভিত ছোট একখানি টেবিল; কিন্তু সে সব

আসন অলঙ্কৃত করবার কি করাবার ব্যাপারে কারও কোন গরজ নেই। মঞ্চের ঠিক নীচেই খানকয়েক চেয়ার। তারই একটিতে আরও দু'তিনজন প্রৌঢ়বয়সী স্থানীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে অস্থায়ী ভাবে হরিবিলাসকেও বসান হয়েছে। সভা শুরু হলেই তিনি মঞ্চারূঢ় হবেন। এদিকে, দুদিকের দুটি মাইক থেকে মাঝে মাঝে ঘোষণা চলছে, "আপনারা সব আসুন, এসে যার যার আসন গ্রহণ করুন, সভার কাজ এক্ষুনি শুরু হয়ে যাবে। সভাপতি অনেকক্ষণ এসে গেছেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক—"

হরিবিলাস হাতের ইশারায় যুবকটিকে কাছে ডেকে এনে বললেন, "ওসব থাক। প্রসিদ্ধি যে কত, তা আর বুঝতে বাকী নেই। আপনারা এবারে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন, না হয় আমাকে বিদায় দিন। সাড়ে তিনটেয় আরম্ভ হবে বলেছিলেন, এখন প্রায় পাঁচটা—"

সেক্রেটারী হাতজোড় করে সবিনয়ে বললেন, "আজ্ঞে এই এক্ষুনি আরম্ভ হয়ে যাবে। বুঝতে পাচ্ছি আপনার খুবই অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু—"

পাশের ভদ্রলোক স্থানীয় স্কুলের টিচার। একটু আগে হরিবিলাসের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে। তিনিও বিরক্ত হয়ে বললেন, "কী করবেন মশাই। এ-জাতের কোষ্ঠীতে পাংচুয়ালিটির নামগন্ধ নেই। আমরা সাহেবদের ধরাচূড়াটুকুই শুধু বাঁধতে শিখেছি, বাঁশি ফুঁকতে শিখিনি। ওহে শৈলেন, তাড়াতাড়ি কর। সত্যিই ত ভদ্রলোক আর কতক্ষণ বসে থাকবেন।" তারপর হরিবিলাসের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, "আসলে দু-তিন জন রেডিও আর্টিস্ট আসবার কথা আছে কলকাতা থেকে। ছেলেরা সেই দুপুরবেলায় আনতে গেছে তাদের। কিন্তু গাড়ি এখনও এসে পৌঁছল না। নিয়মটা ত শুধু একজনের মানলে চলে না হরিবিলাসবাবু, দশজনে মানলেই তবে তা আইন হয়, নিয়ম হয়।

নইলে যা হয় তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।”

কিন্তু সেক্রেটারি এসে হরিবিলাসকে বুঝিয়ে দিলেন প্রখ্যাত গায়করা এসে পৌঁছাননি বলেই যে সভা আরম্ভ হতে দেরি হচ্ছে তা নয়, আধুনিক সঙ্গীতের প্রোগ্রাম সন্ধ্যার পরে। সভার শুরুতেই আছে কলোনীর ছেলেমেয়েদের ফ্যানসি ড্রেসের অনুষ্ঠান। সাজঘরে মেক-আপ নিতে তাদের দেরী হচ্ছে বলেই সভা শুরু করা যাচ্ছে না। এদিকে ছেলেবুড়ো সবাই গিয়ে সেই সাজঘরের চারদিক ঘিরে ভিড় করেছে। মূল সভামণ্ডপের জনবিরলতার কারণও তাই।

হিরবিলাস বিরক্ত হয়ে বললেন, “এক কাজ করুন। ফ্যানসি ড্রেসের আইটেমটা একেবারে শেষে সরিয়ে দিন। আবৃত্তি টাবৃত্তি যদি কিছু থাকে তা-ই দিয়ে শুরু করুন। আমি ছু-এক মিনিট কিছু বলে উঠে পড়ি। আর যদি সেটুকু না হলে আপনাদের চলে তাহলে খুবই ভালো হয়। আমি আর কিছুতেই পাঁচ মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে পারবো না। আমাকে মাপ করবেন।”

সভাপতির এই শক্ত কথাগুলিতে এবার সত্যিই খানিকটা কাজ হল। শুরু হল সভা। অনুষ্ঠান-সূচী ছু'পাতা জোড়া। প্রথমেই উদ্বোধন সঙ্গীত। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ছুটি কিশোরীর কণ্ঠে “সবারে করি আহ্বান”। তাদের পিছনে থেকে আর একটি মেয়ে তাদের সঙ্গে গলা মিলাল। সে অবশ্য কিশোরী নয়। লম্বা ছিপছিপে। একুশ বাইশ বছর হবে বয়স। ভাবভঙ্গিতে মনে হল সে এই ছাত্রী-বাহিনীর পরিচালিকা।

উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভাপতি-বরণ, মাল্যদান এবং তার-পরই একটির পর একট আইটেম সেক্রেটারী শৈলেন চন্দ মাইকের কাছে মুখ নিয়ে ঘোষণা করে যেতে লাগলেন। হরিবিলাস ভেবেছিলেন এক ফাঁকে সভাপতির অভিভাষণটুকু গুঁজে দিয়ে

উঠে পড়বেন। কিন্তু তার কোন ফুরসতই হলো না। সে-প্রস্তাব করবার সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারী আর তার সঙ্গীরা এমন কাতর চোখে তাকাতে লাগলেন, এমন অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন যে, হরিবিলাস কথাটি বলবার সুযোগ পেলেন না। শেষ পর্যন্ত সভা আর সেক্রেটারীর হাতে আত্মসমর্পণ করে তিনি যন্ত্রের মত কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। মাঝে মাঝে যখনই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, সেক্রেটারী বলেন, "ফ্যানসি ড্রেসটা অন্তত আপনাকে দেখে যেতে হবে। শুধু দেখা নয়, বিচারের ভারও আপনার ওপর। তিনটে প্রাইজ আছে আমাদের।"

কিন্তু সাজসজ্জায় সময় লাগে। তাই আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ চলতে লাগল। পাছে সমস্ত অনুষ্ঠানটি একঘেয়ে হয়ে যায়, তাই ফাঁকে ফাঁকে দুটি একটি গানও ভরে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন সেক্রেটারী। সভাপতি দেখলেন ফাঁকা মাঠ এবার সত্যিই ভরে উঠেছে। সামনের শতরঞ্জি আর মাদুরের উপর বাচ্চা ছেলেমেয়েরা গিজগিজ করছে। মাঝে মাঝে গুঞ্জরণের শব্দ। পিছনের চেয়ারগুলির দুটি সারিতে স্ত্রী-পুরুষের দল আলাদা আলাদা হয়ে বসেছেন। সত্তর-পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধবৃদ্ধাও আছেন দর্শকদের মধ্যে। তাঁদের ঔৎসুক্য উল্লাস বীতস্পৃহ এবং গৃহমুখী সভাপতির মনে খানিকটা উৎসাহ সংক্রামিত করে দিল। প্রৌঢ় হরিবিলাসের কাছে এই ধরণের সভাসমিতি সামাজিক অনুষ্ঠান আজকাল বড় একঘেয়ে লাগে। এ যেন সেই যজমানী বামুনের বৃত্তি আবার নতুন আকারে ফিরে এসেছে। এও সেই ঘণ্টা নেড়ে ফুল ছিটিয়ে পেশাদারী পৌরোহিত্য। সবার শেষে বাড়ি ফিরে এসে মনে হয়, কিছুই লাভ হল না, অনেকখানি সময় অপচয় করে এলেন। আয়ু ত অফুরন্ত নয়, জীবন ত ব্যাধিজরাদুশ্চিন্তা দুর্বিপাকমুক্ত নয় যে, মুঠে মুঠে তা ছড়িয়ে দেওয়া যায়। শুধু যৌবনেই তা দেওয়া সম্ভব। তখন ধুলোমুঠি আর সোনামুঠি সব

সমান। তখন সব রেণুই স্বর্ণরেণু। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আফসোস আর হাহাকারে মন ভরে উঠেছে হরিবিলাসের। কিছুই হয়নি, কিছুই হল না। কোন ক্ষেত্রে কোন কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন না তিনি। শুধু সম্ভাবনা। শুধু হলে-হতে-পারার ইশারা। তারপর সেই হাতছানি খানিক দূর এগোতে এগোতে উষর বন্ধ্যা মরুভূমিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে।

তাই যথাসাধ্য তিনি এ ধরণের অনুষ্ঠান-উপলক্ষ্যকে এড়িয়ে চলতে চান। কিন্তু সব সময় তা পেরে ওঠেন না। সংসারে হয় জোর করে 'হাঁ' বলতে জানা চাই না হয় 'না' বলতে পারা চাই। কিন্তু হরিবিলাসের মত যাঁরা 'হাঁ' আর 'না'র মাঝখানে বাস করেন, তাদের ভ্রান্তিবিলাসের শেষ হয় না। তাঁরা কোন সময়ে রাজিও নন, গররাজীও নন, সব সময়ে নিমরাজী। তাই যেমন তাদের জীবন, তেমনি রচনায় দ্বিধা আর কুণ্ঠা জড়িয়ে থাকে। মনের কুয়াশায় সৃষ্টির মুখ ঢাকা পড়ে। সে-গুণ্ঠন খোলে এত গরজ কার!

কিন্তু বিভিন্ন বয়সী অপরিচিত একদল দর্শকের উৎসাহভরা চোখে চোখ রাখতে আজ মন্দ লাগছিল না হরিবিলাসের। এই উদ্বাস্তু পল্লী আজ উৎসবের বেশে সেজেছে। দেবদারু-পাতায় আর রঙিন কাগজে তোরণ সাজিয়েছে।

সভামণ্ডপের সামনে আলপনা দিয়েছে মেয়েরা। মাটির কলসে রেখাচিত্র। মাটির পৃথিবীতে মানুষের পদসঙ্কেত। মোছে, মিলায় আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একটু দূরে আটপৌরে দৈনন্দিন জীবনের পটভূমি। সারি সারি ছোট ছোট ঘর। বাঁখারির বেড়া, করোগেট টিনের চাল, কখনও বা টালি। আশেপাশে আম-জাম পেয়ারা-নারকেলের সবুজ শোভা। দিগন্তে দুটি শিমুলের চূড়া। উদ্দীপ্ত বাসনায় রক্তবর্ণ।

উৎসবের রঙ প্রৌঢ়, ব্যক্তিগত ব্যর্থতার-বেদনায়-বিষণ্ণ সভাপতির

মনকে আস্তে আস্তে রঞ্জিত করতে লাগল। শুরু হয়েছে পুরস্কার বিতরণ। দিন দুয়েক আগে স্পোর্টস হয়ে গিয়েছে। লাফ-ঝাঁপ দৌড় আর দড়ি-টানাটানির প্রতিযোগিতা। 'ক' বিভাগ, 'খ' বিভাগ, 'গ' বিভাগ। প্রতি বিভাগে তিন চারটি করে পুরস্কার। কাপ, মেডাল, ব্যাগ, স্যুটকেস, বই। সেক্রেটারী সর্বাগ্রে দাতা আর গ্রহীতাদের নাম ঘোষণা করে যেতে লাগলেন। নানাবয়সী ছেলেমেয়েরা হরিবিলাসের হাত থেকে পুরস্কার নিয়ে যেতে লাগল। ফ্রক-পরা বেণীদোলান বিজায়নীরা নমস্কার জানাল। দশ-বার বছরের একটি সপ্রতিভ সুদর্শন ছেলে পরিস্কার বলল, "হাত দিন, হ্যাণ্ডশেক করব।"

হরিবিলাস মৃদু হেসে হাতখানা এগিয়ে দিলেন। ছেলেটি সেই কলম-পেষা কড়া-পড়া আঙ্গুলগুলি নিজের মুঠির মধ্যে নিয়ে প্রাণ-পণে ঝাঁকুনি লাগাল। আর সেই স্ফুলিঙ্গ স্পর্শে সেই ঝাঁকুনিতে, হরিবিলাসের মুষড়ে পড়া সমস্ত সত্তা যেন নাড়া খেয়ে জেগে উঠল। তিনি হেসে বললেন, "বেশ বেশ, বহুত আচ্ছা।" তারপর চলতে লাগল সেই করকম্পনের পালা।

ছেলেরা হাসছে, মেয়েরা হাসছে, তাদের বাবা-কাকা-মা-খুড়ীর উৎসুক চোখগুলি গর্বে আহ্লাদে কৌতুকে সুখে অপরূপ হয়ে উঠেছে। দেখতে দেখতে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন হরিবিলাস। অনেকদিন বাদে তিনি সত্যিই এক রমণীয় উৎসবের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছেন। পাথরচাপা উৎসমুখ আবার কি কলনাদে মুখর হয়ে উঠবে?

"পালিশ, বাবু; পালিশ।"

হঠাৎ অস্বস্তি আর বিরক্তি বোধ করলেন হরিবিলাস। বার-তের বছরের একটি অতি নোংরা নেংটি-পরা ছেলে হাঁটু পেতে পায়ের কাছে বসে হরিবিলাসের জুতো ধরে টানাটানি করছে, "দিন না বাবু, পালিশ করে দিচ্ছি।"

সভাপতির বড় চেয়ারখানিতে কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হয়ে বসলেন

হরিবিলাস। নাছোড়বান্দা পালিশ-ওয়ালাকে প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বসলেন হরিবিলাস, "যা যাঃ পালিশ লাগবে না, যা বলছি।"

আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কলোনী কৌতুকের হাসিতে ফেটে পড়ল। সভাপতি এবার নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। আসল পালিশ-ওয়ালা নয়, সেজে এসেছে। কিন্তু সেজেছে চমৎকার! কাঁধে সেই কালি আর ব্রুসের ঝুলি। খোলা গা। ময়লা হাত পা। ধরবার জো নেই। কিন্তু এরপর কেউ আর সভাপতিকে ঠকাতে পারলো না। দুটি ভিখারী ছেলে এসে ভিক্ষা চাইল। একটি খোঁড়া আর একটি নুলো। তারপর এল একটা পাগল। উস্কোখুস্কো চুল, গায়ে ছেঁড়া জামা, কোঁচড়ে করে রাজ্যের ছেঁড়া কাগজ আর টুকরো জিনিষ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এল গাঁটকাটা পকেটমার। সন্তর্পণে পা টিপে টিপে এসে একজন সম্ভ্রান্ত দর্শকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। মেয়েরাও এইসব বেশ পছন্দ করেছে। কেউ সেজেছে ভিখারিণী, কেউ ঘুঁটেকুড়ুনি বুড়ি, কেউ বা ঝাঁটা আর ময়লার বালতি হাতে ঝাড়ুদারনী। অবশেষে একটি রুগ্না মেয়ে এল কাশতে কাশতে। কাশির দমকে তার দু চোখ যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। কাশছে আর থুথু ছিটচ্ছে। মাঝে মাঝে থুথু ফেলছে মাটিতে। জ্বরের ঘোরে ভালো কথা বলতে পারছে না। ঘুরে ঘুরে পড়ছে বার বার। তারপর খানিকটা উঠে আবার কাশতে শুরু করছে। সভাপতি নাক মুখ কুঁচকে বিরক্ত হয়ে বললেন, "আঃ থাম থাম। ঢের হয়েছে। বীভৎস।"

দর্শকের ভিতর থেকে আর একবার হাসির কলধ্বনি শোনা গেল।

সেক্রেটারীর নির্দেশে রূপসজ্জাকারীরা এবার সভাপতির সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল। এদের মধ্যে কার সজ্জা, কার অভিনয় নিখুঁত, প্রথম তিনজনের মধ্যে কে কে আছে, সভাপতিকে তা বেছে নিতে হবে।

হরিবিলাস বললেন, "শুধু আমি বললেই কি চলবে ?"

সেক্রেটারি হেসে বললেন, "হ্যাঁ স্যার, আপনার রায়ই চূড়ান্ত। জাজ হিসাবে এটায় আমরা আর কাউকে নেইনি। বড় গোলমাল হয়।"

সভাপতি আর একবার সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। লক্ষ্য করলেন উদ্বোধন সঙ্গীতের সময় যে দীর্ঘাঙ্গী তরুণী মেয়েটিকে দেখেছিলেন সে-ই যক্ষ্মারোগিণী সেজেছে। রোগের কষ্ট এই মুহূর্তে আর মুখে নেই। তার বদলে আত্মপ্রসাদের হাসি চিকচিক করছে।

হরিবিলাস কাগজের টুকরোতে তিনটি নাম লিখে সেক্রেটারিকে দিলেন। তিনি তাতে চোখ বুলিয়ে একটু যেন বিস্মিত হলেন। তারপর সেই কাগজের টুকরোটুকু মাইকের সামনে নিয়ে ঘোষণা করলেন, "ফ্যানসি ড্রেসের প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতির সিদ্ধান্ত আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি। প্রথম হয়েছে পালিশওয়ালা সাজে শ্রীমান দিব্যেন্দু সেন, দ্বিতীয় ঝাড়ুদারনীরূপিণী শ্রীমতি কল্যাণী সাহা, তৃতীয় ভিখারিণী শ্রীমতি সুলেখা চন্দ।"

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক মহলের ভিতর থেকে গুঞ্জন উঠল, "সে কি। রমা একটা প্রাইজও পেল না!"

"আশ্চর্য, রমাদি পেল না! ও যে হিটে ফার্স্ট হয়েছিল।"

"রমা গাঙ্গুলী বাদ পড়ল কী করে! উঁহু, প্রেসিডেন্টের বিচারটা প্রেসিডেন্টের মত হয়নি"

সেক্রেটারি আর একবার মাইকের কাছে মুখ নিলেন, "আমাদের মাননীয় সভাপতির বিচারই চরম। তিনি বহু নাটক লিখেছেন, রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছেন, পরিচালনা করেছেন। এখানে তাঁর চেয়ে বড় রূপদক্ষ আমাদের মধ্যে কেউ আর নেই। আপনারা গোলমাল করবেন না, ধৈর্য করে শান্তভাবে থেকে সভার বাকী কাজটুকু শেষ করতে দয়া করে আমাদের সাহায্য করবেন।"

তিনটি পুরস্কার বিতরণের আগে সভাপতি একবার মৃদুস্বরে সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "রমা মেয়েটি কে?"

সেক্রেটারি বললেন, "ওই যে-মেয়েটি যক্ষ্মারোগিণী সেজেছে। আপনি ওসব কান দেবেন না।"

হরিবিলাস আর একবার মেয়েটির দিকে তাকালেন। প্রাইজ না পেয়ে সে যে খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েছে তা মনে হল না।

পুরস্কার দানের পালা শেষ করে সভাপতি তাঁর ভাষণ দিতে উঠলেন। গোড়াতে এই উদ্বাস্তু-কলোনির উদ্যোগে উদ্যম ও আন্তরিকতাকে অভিনন্দন জানালেন। উদ্বাস্তুদের অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের সমস্যার আজও সমাধান হয়নি, সে-কথা উল্লেখ করে সরকার পক্ষের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করলেন। সেই সঙ্গে কি ব্যক্তিগতভাবে, কি গোষ্ঠী-গতভাবে, উদ্বাস্তুদেরও স্বাবলম্বী হবার পরামর্শ দিলেন। তারপর বললেন, "এইবার আপনাদের রূপসজ্জা সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলব। যদি কথাগুলি কিছু অপ্রিয় হয়, আপনারা ক্ষুণ্ণ হবেন না। হিতৈষী প্রিয় বন্ধুরই সমালোচনার অধিকার আছে। আপনারা সেই বন্ধু হিসাবেই আমাকে আজ ডেকে এনেছেন। ছেলেমেয়েরা আজ যে অঙ্গসজ্জা নিয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে, আমার মনে হল সেই সাজের সঙ্গে আজকের এই শুভ-উৎসবের মিল নেই। এ-সাজের নাম হল খুশির সাজ। নিজের খুশিমত ছেলেমেয়েরা সাজবে। কিন্তু রূপ-নির্বাচন দেখে মনে হল না এইসব সাজসজ্জার পিছনে কারও মনের খুশি আছে। তার চেয়ে আড়ালের কোন বিশেষ একটি অঙ্গুলী-নির্দেশই যেন চোখে পড়ল। কিন্তু দারিদ্র্য, অবিচার, অব্যবস্থা, আর তার পরিণতি চৌর্য, ভিক্ষা, বুভুক্ষা, যক্ষ্মা এগুলি যে দেশে আছে তা কি এমন করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে? চোখের ভিতরে আঙুল ঢুকে গেলে আমরা সু-ও দেখিনে, কু-ও দেখিনে, শুধু অন্ধকার দেখি। এর চেয়ে ছেলেমেয়েদের রূপকথার রাজ্যে ছেড়ে দিতে পারলেই যেন শোভন হত। তারা যদি নিজেদের পছন্দ

অনুযায়ী রূপ বেছে নিত তাহলে কারও কারও অন্তত রাজা রাণী ভূত কি পরী হতে সাধ যেত। তাদের সেই স্বাভাবিক কল্পনাকে বাস্তবের অনুশাসনে যদি আমরা এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধি, তাহলে তা রূপসজ্জা না হয়ে কুরূপসজ্জা হয়ে ওঠে। কল্পনাকে লজ্জার বস্তু বলে মনে করবেন না। জীবনে পরিকল্পনা যেমন দরকার, পরীর কল্পনাও তেমনি। আমরা যেমন অবিচার, অনাচার, দুঃখ দারিদ্র্য-বঞ্চনা-লাঞ্ছনার সঙ্গে সংগ্রাম করব তেমনি রূপসৃষ্টিও করব। সেই সৃষ্টির কাজ সঙ্গে সঙ্গে চলবে। সংগ্রাম শেষ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করবে না। সেই সৃষ্টি আর সংগ্রামের ভাষা কখনও কখনও মিলবে, কখনও মিলবে না, কারও কারও মিলবে, কারও বা মিলবে না। সৃষ্টির এই রূপ-বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে না নিলে অনাসৃষ্টি এবং অপসৃষ্টি হবার আশঙ্কা আছে।"

সভাপতি থামলেন, কিন্তু অসন্তোষের গুঞ্জরণ সঙ্গে সঙ্গে থামল না। পাছে আরও কটু সমালোচনা তাঁর কানে যায়, তাই সেক্রেটারি তাঁকে সঙ্গে করে সভামণ্ডপের বাইরে গেলেন।

হরিবিলাস বললেন, "ঈস, অনেক দেরি হয়ে গেল। শৈলেনবাবু, এবার যাবার ব্যবস্থা করে দিন।"

সেক্রেটারি হেসে বললেন, "ট্যাকসি ডাকতে লোক পাঠিয়েছি। কিন্তু বড়রাস্তার মোড় থেকে নিয়ে আসতে হয়ত মিনিট দশেক দেরি হবে! আপনি ততক্ষণে একটু চা-টা—"

হরিবিলাস বিরক্ত হয়ে বললেন, "না না, ওসব থাক। এমনিতেই যথেষ্ট দেরি হয়েছে। মাপ করবেন আমাকে।"

কিন্তু শৈলেনবাবু ছাড়লেন না। তিনি তাঁর ঘরের ঘেরা বারান্দায় সভাপতিকে নিয়ে বসালেন। ক্লাবের ছেলের দল ভিড় করে আসছিল, শৈলেনবাবু বললেন, "তোমরা এখন যাও। ওদিককার কাজটাজ দেখ গিয়ে। ওঁকে বিরক্ত কর না।"

ছেলেরা চলে গেল। একটু বাদে ভিতরের দরজা খুলে সেই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি বেরিয়ে এল। এরই মধ্যে মেক-আপ ধুয়ে মুছে

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। প্লেটে করে এনেছে নারকেল-নাড়ু, চিড়ের মোয়া আর দুটি কাঁচাগোল্লা।

হরিবিলাস বললেন, "এসব কেন।"

রমা বলল, "খান। সবই ঘরের তৈরী।"

চাঁপা রঙের শাড়িখানা তন্বী শ্যামাঙ্গী মেয়েটিকে চমৎকার মানিয়েছে। নাক চোখ চিবুকের গড়নে ওকে বেশ সুন্দরী বলেই মনে হচ্ছে এখন। হরিবিলাস মৃদু হেসে বললেন, "তুমি লক্ষ্মীর মেক-আপটি তখন নিলে না কেন বলত। তাহলে আমি তোমাকে ফার্স্ট প্রাইজ দিতাম।"

রমা কোন জবাব দিল না। শুধু লজ্জিত ভঙ্গিতে মুখখানা নামিয়ে নিল।

হরিবিলাস আর শৈলেনবাবুকে চা দেওয়ার পর রমা সবিনয়ে বিদায় নিয়ে বলল, "আমি এবার আসছি, ওদিকে সব আবার পড়ে রয়েছে।"

হরিবিলাস বললেন, "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। তুমি তোমার কাজে যাও। আমাকে ত এক্ষুনি উঠতে হবে।"

কিন্তু উঠবার আগে হরিবিলাস হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার ওই কথাগুলিতে আপনারা কি খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছেন?"

শৈলেনবাবু বললেন, "না, না, ক্ষুণ্ণ কেন হব। আমাদের সব কাজেরই আলোচনা-সমালোচনা হক, তাই ত চাই। তবে আপনি যা বলেছেন, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই ফ্যানসি ড্রেসের পরিকল্পনা করা হয়েছে, তা বোধ হয় ঠিক নয়। অন্তত আমরা করিনি। আমি বলে দিয়েছি, তোমাদের যার যা খুশি তাই সেজে এস। তবে এ ব্যাপারে রমার হয়ত কিছুটা হাত থাকতে পারে। ওর কথা ছেলে-মেয়েরা সবাই শোনে।"

হরিবিলাস হেসে বললেন, "ওই বুঝি দলের নেত্রী?"

শৈলেনবাবু বললেন, "নেত্রী? তা বলতে পারেন। রবীন্দ্র-জয়ন্তী, সরস্বতী পুজো, ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান, যে কোন ব্যাপারে

রমাকে না হলে আমাদের চলে না। সত্যি এমন কাজের মেয়ে এখানে দুটি নেই। গান-বাজনা, অভিনয়, হাতে-লেখা কাগজ চালান, ওয়াল-পেপার বার করা, ওর যে কোন বিষয়ে উৎসাহ নেই, তা-ই বোঝা শক্ত।"

হরিবিলাস জিজ্ঞাসা কবলেন, "বাপ-মা আছেন?"

শৈলেনবাবু বললেন, "আছেন। বাপ স্টেট ট্রান্সপোর্টে সামান্য চাকরি করেন, গুটিচারেক ছেলেমেয়ে। মা নিত্যরোগী, খিটখিটে মেজাজ। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাচ্চাগুলিকে আচ্ছা করে মারেন। তারপর কেঁদে চেঁচিয়ে পাড়া অস্থির করে তোলেন। নিত্য অশান্তি ওদের সংসারে। এসব অশান্তি কারই বা নেই? কিন্তু সবচেয়ে বড় অশান্তি ওই মেয়েকে নিয়ে।"

হরিবিলাস অবাক হয়ে বললেন, "বলেন কী? অমন লক্ষ্মী মেয়ে, তাকে নিয়ে অশান্তি কেন হবে?"

শৈলেনবাবু বললেন, "হরিবিলাসবাবু, আপনি তো অনেক দেখেছেন শুনেছেন? যারা গুণী, যারা ভাল, তাদেরই কি সংসারে বেশী দুঃখ পেতে দেখেন নি? আমার তো ধারণা তারাই কষ্ট পায় বেশী। ওই মেয়ে নিজেও যেমন কষ্ট পাচ্ছে, বাবা-মাকেও তেমনি কষ্ট দিচ্ছে।"

হরিবিলাস বললেন, "কী রকম?"

শৈলেনবাবু বলতে লাগলেন, "গরীব হলেও ওর বাবা, মেয়ের বিয়ের কথা বহুদিন ধরেই ভাবছেন, চেষ্টা-চরিত্র করছেন। করবেনই বা না কেন? সবাই নিজের ছেলেমেয়ের সুখশান্তি চায়। তা ছাড়া ভদ্রলোকের এই প্রথম সন্তান। চেয়ে-চিন্তে ধারটার করে দু-দুবার তিনি মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। অবস্থা অনুযায়ী দুটি সম্বন্ধই বেশ ভাল এসেছিল। তার মধ্যে একজন ওঁরই অফিসে কাজ করে। বাবা-মা আছে, বাসা আছে কলকাতা শহরের ওপর। বয়সও এমন কিছু বেশী নয়। তিরিশের মধ্যেই।

ছেলেটি নিজেই দেখে রমাকে পছন্দ করেছিল। পছন্দ করার মতই তো মেয়ে। নিজের চেষ্টায় স্কুল-ফাইন্যাল গত বছর পাশ করেছে। পাশ অনেকেই করে। কিন্তু টোকা দিয়ে দেখুন, একেবারে ফাঁকা। ও-মেয়েটা কিন্তু তা নয়, যেটুকু লেখাপড়া শিখেছে, ভাল করেই শিখেছে। ওপক্ষ পছন্দ করে গেলে কি হবে, মেয়ের এক কথা কিছুতেই বিয়ে করবে না। মেয়ে বড় করে বিয়ে দেওয়া ওই এক জ্বালা, তার অমতে কিছু করা যায় না।"

হরিবিলাসবাবুর ট্যাক্সি আসতে দেরী হচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে-কথা তিনি বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন। অন্তত আগের মত ঘন ঘন তাড়া দিচ্ছেন না!

"কিন্তু অমতই বা হল কেন?"

শৈলেনবাবু চেয়ারাটা আর একটু টেনে নিয়ে ঘন হয়ে বসলেন, তারপর গলা নামিয়ে বললেন, "সে আবার আর-এক কাহিনী। নিজেদের কলোনির ব্যাপার। বলতে সঙ্কোচ হয়।"

হরিবিলাস একটু হতাশার সুরে বললেন, "অবশ্য আপনার যদি আপত্তি থাকে—!"

শৈলেনবাবু বললেন, "না না, আপত্তি কিসের। তাছাড়া, এ-ব্যাপারটা এখন প্রায় সবাই জানে। তবে কেউ আর এ-সব নিয়ে ঘোঁট পাকায় না। হাসিঠাট্টাও করে না। ওর স্বভাবের গুণে ওকে সবাই ভালবাসে। বিপদ-আপদে অসুখ-বিসুখে ও গিয়ে সবচেয়ে আগে হাজির হয় কিনা। তাই বলে গোড়াতেই ভিন-কলোনির সুনীল চক্রবর্তীকে সবাই পছন্দ করেছিল তা নয়। বরং এই কলোনির ছেলেরা ওকে হিংসেই করত। হিংসা করবারই কথা। সাতাশ-আঠাশ বছর বয়সেই মাথার আধখানা জুড়ে টাক পড়েছে। তাতে বয়সটা আরও বেশী দেখায়। চেহারাও খারাপ। যেমন কাল, তেমনি রোগাটে পাকান দড়ির মত শরীর। রমার মত মেয়ে তাকে যদি পছন্দ করে, এখানকার ছেলেরা হিংসের

জলবে না কেন! গুণের মধ্যে একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে পারে। আর এইসব ফাংশন টাংশন অর্গানাইজ করতে পারে। কলকাতায় গিয়ে সভাপতি, প্রধান অতিথি আর আর্টিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করা থেকে শুরু করে স্টেজ বাঁধা, আলো আর মাইক-টাইকের ব্যবস্থা করা, সব ব্যাপারেই স্থনীলের যোগ্যতা আছে। সে-কথা এখানকার লোকে আজও স্বীকার করে। কিন্তু তাই বলে—।"

শৈলেনবাবু একটু থেমে বললেন, "আপনার বোধ হয় দেরি হয়ে যাচ্ছে। ট্যাক্সি আবার সব সময় এদিকে পাওয়া যায় না। কিন্তু গেছে যখন, নিয়ে আসবেই। চিড়িয়ার মোড় থেকে আনলেও আনবে।"

হরিবিলাস বললেন, "দেরি অবশ্য খুবই হয়ে গেল। হ্যাঁ, তারপর ?"

শৈলেনবাবু বললেন, "বছর তিনেক আগে এইরকম একটা ফাংশনেই ওদের আলাপ হয়েছিল। এখানকার ছেলেরাই ডেকে এনেছিল স্থনীল চক্রবর্তীকে। তারপর থেকে বিনা ডাকেই ও আসতে লাগল। অনুষ্ঠানটনুষ্ঠানের আর দরকার হয় না। এই কলোনির জল হাওয়ার মধ্যে যেন মধু আছে! স্থনীল আসে আর রমাদের বারান্দায় বসে নানারকম গল্পগুজব করে। কোথায় কোন মিটিং হচ্ছে, কোন কলোনির মধ্যে কাজ ভাল হচ্ছে, কোথায় দলাদলি মেটাবার জন্যে স্থনীল আপ্রাণ চেষ্টা করছে, বেশির ভাগই এই সব কথা। কিন্তু পাড়া পড়শীরা অন্য রকম সন্দেহ করতে লাগল। বয়সের ছেলেমেয়ে যখন নিজেদের মধ্যে সাদামাঠা কথাও বলে, তখনও বলবার ধরণে আর-পাঁচজনের চোখ অন্যরকম দেখে। পাঁচ জনকে দোষ দিয়ে কী হবে, রমার বাবাই আপত্তি করলেন। মেয়েকে ডেকে বললেন, 'তুই ওর সঙ্গে অত মিশতে পারবিনে। লোকে নানা কথা বলতে শুরু করেছে।' মেয়ে বাপের

কথা দুদিন শোনে তো তিন দিনের দিন অবাধ্য হয়। প্রকাশ্যে মানে ত গোপনে মানে না! এই নিয়ে অশান্তি, ধমকানি চোখ রাঙানি। শেষে একদিন রমার বাপ ওকে ডেকে বললেন, তুই ওই হতচ্ছাড়াটার মধ্যে কি দেখলি বল ত। রূপে ত ওই কার্তিক। গুণের মধ্যে শুনেছি ম্যাট্রিকটা পর্যন্ত পাশ করতে পারেনি। মা নেই, বাবা নেই, মামার সংসারে খায় আর বনের মোষ তাড়ায়। আমি সব খোঁজ খবর নিয়ে তবে বলছি। তুমি যতই বল মেয়ে, আমি তোমাকে ওই বাঁদরটার হাতে কিছুতেই ধরে দিতে পারব না। গরীব হওয়ার যে কী দুঃখ তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, আর ও ত একেবারে পথের ভিখারী। মেয়ে চুপ করে থাকে, কিন্তু নিজের গোঁ ছাড়ে না। ফলে সুনীলকে একদিন অপমান করেই তাড়ালেন রমার বাবা। নাম বলে লাভ নেই, এখানকার কোন কান ছেলেরও তাতে সাহায্য পেলেন। তারপর শুনেছি সুনীল সভাসমিতি ফাংশন-টাংশন কমিয়ে দিয়ে চাকরির চেষ্টায় মন দিয়েছিল। কিন্তু চাকরি তো মুখের কথায় হবার নয়, এমন কি যেমন তেমন লোকের কলমের সুপারিশেও কোন কাজ হয় না। জানেনই ত সব। শেষ পর্যন্ত লাজলজ্জা ছেড়ে বেলঘরিয়ার একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ নিয়েছিল। বাঁধা ডিউটি ছাড়াও ইচ্ছা করে ওভার টাইম খাটত। দুজনে মিলে নাকি পরামর্শ করেছিল হাতে কিছু টাকা জমলেই লুকিয়ে বিয়ে করবে, তারপর কলকাতায় গিয়ে বাসা করে থাকবে। এই যে আপনার ট্যাক্সি এসে গেছে হরবিলাসবাবু!"

হঠাৎ শৈলেন বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দোরের দিকে এগিয়ে গেলেন, তারপর একটু তিরস্কারের সুরে বললেন, "তোমরা বড়ই দেরি করে ফেললে নির্মল। ছি ছি, ওঁকে কতক্ষণ ধরে বসিয়ে রেখেছি বলত।"

কিশোরবয়সী একটি ছেলের মিষ্টি অভিমান-ভরা গলা শোনা গেল, "কী করব বলুন শৈলেনদা, ট্যাক্সি কি এদিকে সহজে মেলে!

সব প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছে। একটা খালি পেলাম ত কিছুতেই এল না।”

শৈলেন বাবু বললেন “থাক থাক। তোমাদের বাহাদুরী বোঝা গেছে!” তারপর হরবিলাসবাবুর দিকে চেয়ে গলার স্বর আর মুখের ভঙ্গী পালটে বিনয়ে মধুর হেসে বললেন, “আসুন। বড়ই কষ্ট হল আপনার। এত কাজকর্ম ফেলে দয়া করে যে এসেছেন।”

হরিবিলাসকে সযত্নে গাড়িতে তুলে দিলেন শৈলেনবাবু। ট্যাক্‌সিভাড়াটা সংগোপনে গুঁজে দিলেন হাতের মধ্যে। ফেলে-আসা রজনীগন্ধার মালাটাও তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিলেন সেই সঙ্গে। হঠাৎ তার গন্ধটা ভারী মধুর লাগল। গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছিল, দ্বিধা সংকোচ ত্যাগ করে হরিবিলাস জিজ্ঞাসা করে বসলেন, “হ্যাঁ তারপর কি হল ওদের? কী হল সেই ছেলেটির?”

শৈলেনবাবু একটু যেন থমকে গেলেন। হারিয়ে-যাওয়া কাহিনীকে কুড়িয়ে আনতে আনতে, ছিঁড়ে যাওয়া সুতোকে গিঁট দিতে দিতে বললেন, “কী আর হবে। অত গোয়ার্তুমি কি সয়। ওই শরীরে অত অনিয়ম-অত্যাচার সহ্য হবে কেন। ছ’মাস যেতে না যেতেই বিছানা নিল! একেবারে রাজব্যাধি। প্রথমদিকে প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই ছিল, মামারই বা কী এমন ক্ষমতা যে চিকিৎসা করবে! অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর শেষে কাঁচড়াপাড়ায় বেড পাওয়া গেছে। ডাক্তার ধমক দিয়ে বলেছেন, একেবারে শেষ করে এনেছেন?”

গাড়ি ছেড়ে দিল। পিছনের সিটে একটি কোণ নিয়ে নিঃসঙ্গে নিস্তব্ধভাবে ঠেস দিয়ে বসে রইলেন হরিবিলাস। রজনীগন্ধার মিষ্টি গন্ধটুকু এখনও হাওয়ায় লেগে রয়েছে। ফাল্গুনের শুরু। তবু বাতাসে বেশ একটু শিরশিরে শীত। শালের পাট ভেঙে গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিলেন হরিবিলাস। বি. টি. রোডে

পড়বার আগে আর একটি সরু কাঁচা রাস্তা। দুদিকের ঠাসা জঙ্গলে অন্ধকার বাসা বেঁধেছে। সেই আবছায়ায় রমার মুখখানি ফের ভেসে উঠল। হরিবিলাস ভাবতে লাগলেন তবু, তবু ওকে বোধ হয় পুরস্কার না দিয়ে ভালই করেছেন। ওর পুরস্কারের কোন দরকার ছিল না!

দ্বৈত

বাইরের ঘরে বসে সবে লেখার তোড়জোড় করছিলাম, খোলা দরজা দিয়ে একটি অপরিচিত ছেলে পরম আত্মীয়ের মত এসে ঘরে ঢুকল, তারপর আমার সামনে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, 'এই যে কল্যাণ দা, আজ ঘরেই আছেন দেখছি। আমাকে চিনতে পারছেন না ? আমি নিমু।'

নাম শোনবার পরেও ব্যক্তিটিকে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলাম না। তেইশ চব্বিশ বছর হবে ছেলেটির। ছিপছিপে দোহারা গড়ন। ফর্সা রঙ, সুপুরুষ বলা যায় না। তবে মাজা ঘষা চেহারা। দাড়ি গোঁফ নিখুঁৎ ভাবে কামানো। পরণে আদ্দির পাঞ্জাবি। মাথায় ব্যাক ব্রাশ করা ঘন লম্বা চুল। পায়ের জুতো নতুন না হলেও পালিশ মসৃণ। বেশে বাসে খুব ছিমছাম ছেলে। নিমু আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল। একটু বাদে বলল, 'এখনো চিনতে পারছেন না! লেখকরা এমন ভুলো মনই হয়ে থাকেন। রেখাদি'কে ডাকুন। তিনি চিনবেন। আমি চন্দনপুরের নিমু। নিমাই রায়। নিতাই রায়ের ভাই। এর আগে দু'দিন এসে ঘুরে গেছি। কেন রেখাদি বলেননি আপনাকে ?'

বললাম, 'ও, তুমি। তাই বল!'

নিমাইকে চিনতে পেরে এবার আমি স্বস্তি বোধ করলাম।

চন্দনপুর আমাদের পাশের গ্রাম। আর ওর বড় দাদা নিতাই আর আমি স্কুল কলেজে একসঙ্গে পড়েছি। কিন্তু দশ বছর ধরে গ্রাম আর গ্রামবাসীদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। নিতাইরাও গ্রামের বাস তুলে দিয়ে বহুকাল ধরে মানিকতলায় বাসা করে আছে। অফিসে যাওয়ার পথে ট্রামে বাসে কদাচিৎ দেখা সাক্ষাৎ হয়। নিতাই বলে, 'যেয়ো একদিন।'

আমি বলি, 'তুমি আগে এসো।'

ওই বলা পর্যন্তই। আমারও যাওয়া হয় না, তারও আসা হয় না। নিমাইকে এবার আমি ঘরের দ্বিতীয় চেয়ারখানায় বসতে বললাম। কিন্তু সে চেয়ারে না বসে সবিনয়ে তক্তপোষের এক কোণে গিয়ে বসল।

বললাম, 'কিছু মনে কোরোনা নিমু। হাফপ্যান্ট থেকে কোঁচানো ধুতিতে এসে তুমি একেবারে আমূল বদলে গেছ। তাই চিনতে দেরি হচ্ছিল।' মুহূর্তের মধ্যে নিমাইর স্মিত মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। মৃদু করুণ স্বরে সে বলল, 'চেহারাই বদলেছে কল্যাণ দা, আর কিছু বদলায় নি। একেবারে পাথর চাপা কপাল।'

একটু শঙ্কিত হলাম। তবে কি চাকরি বাকরি কিছু নেই? নিতাই কি আমার কাছে ওকে চাকরির উমেদারিতে পাঠিয়েছে?

বললাম, 'ছি ছি ছি, ওসব কপাল টপাল তোমাদের মুখে মানায় না। কি করছ টরছ তাই বল। বাড়ির সব আছেন কেমন? তোমার বাবা মা ভাই বোনেরা—'

নিমাই বলল, 'তা এক রকম করে সবারই চলে যাচ্ছে কল্যাণ দা। শুধু আমিই ভাল নেই। আমিই কোন শান্তি পাচ্ছিনে।'

'কি এমন অশান্তির কারণ ঘটল?'

নিমাই বলবার জন্যেই এসেছে। আস্তে আস্তে সবই খুলে বলল। পড়াশুনা বেশিদূর করতে পারে নি নিমাই। একবার ফেল করবার পর থার্ড ডিভিসনে আই এ, পাশ করেছে। তারপর

আর পড়ায় মন যায় নি। বাড়ির কেউও তার পড়া সম্বন্ধে আগ্রহ দেখান নি। সেজন্য ভাগ্যকে দোষ দেয় না নিমাই। পড়াশুনো যে হয়নি সে তার নিজের দোষেই। তারপর কাজকর্ম চাকরি বাকরি। তাতেও সুবিধা করে উঠতে পারে নি নিমাই। জন দুই বন্ধুর সঙ্গে মিলে ব্যবসা করেছে। একবার দিয়েছিল লণ্ড্রি আর একবার স্টেশনারি দোকান, কোনটাই চলে নি। বইয়ের দোকানের ক্যানভাসারের চাকরি নিয়ে সেবার বীরভূম মেদিনীপুর চষে বেড়িয়েছে। সে চাকরিও স্থায়ী হয় নি। এখন আছে ক্যানিং স্ট্রীটের এক পেপার মার্চেন্টের অফিসে। খাটনির তুলনায় মাইনে যৎসামান্য! কিন্তু লক্ষ্মীর কৃপা যে তার ওপর হয় নি সে জন্যও নিমাই ভাগ্যকে দোষ দেয় না, দেশের গবর্ণ-মেণ্টকেও না। সব দোষ সে নিজের ঘাড়ে তুলে নিতে রাজি আছে। শুধু একটি ব্যাপার ছাড়া। সে ব্যাপারটি তার একেবারে নিজস্ব। তার জন্যেই এমন চঞ্চলচিত্ত নিমাই। সর্বহারা ঘরছাড়া।

ওর কথার ভঙ্গিতে কৌতুক বোধ করে হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপারটা কি?'

নিমাই লজ্জিতভাবে বলল, 'তিনি আমার দুষ্টা সরস্বতী। ছেলেবেলা থেকেই অভিনয়ের সখ ছিল কল্যাণদা! বয়স যত বাড়ছে সরস্বতী আমার ঘাড়ে তত শক্ত হয়ে চাপছেন। কত নিন্দামন্দ, কত দূর দূর ছাই ছাই। কিন্তু ভূত নামছে না ঘাড় থেকে। আর্টের ভূত তো কোন দিন নামে না কল্যাণদা। বরং যাকে ধরে তাকেই ভূত করে ছাড়ে। আমার দুঃখ আপনি বুঝবেন কল্যাণদা, তাই আপনার কাছে এলাম। বড় হোক ছোট হোক সব নদীই নদী। ঢোঁড়া হোক গোখরো হোক সব সাপই সাপ। নিজের বিষে নিজে জ্বলে। আর্ট একটা অভিশাপ কল্যাণদা।'

আমি ওর কথার ধরণে চমৎকৃত হলাম। একটু হেসে বললাম, 'এত অল্প বয়সে তুমি এসব কথা বুঝলে কি করে?'

নিমাই তার জীবন কাহিনী সবিস্তারে বলতে লাগল। বয়স অল্প হলে কি হবে। জীবনে তার অভিজ্ঞতা কম হয় নি। কলকাতার পেশাদার থিয়েটার গুলিতে সে বহু দিন হাঁটাহাঁটি করেছে। কোথাও কোন সুবিধা হয় নি। বড় মেজো সেজো সব কর্তারই তাঁবেদারি করেছে, তবু তাঁদের হৃদয় দুয়ার খোলে নি। অপেশাদারি কি আধা পেশাদারি থিয়েটারের দলগুলিতে বার বার মাথা গলাতে চেষ্টা করেছে। সে সব জায়গার ভিতরের অবস্থা আরও খারাপ, নানারকম ক্লিক, দলাদলি। একটা দল ভেঙে দুদিনের মধ্যে তিনটে দল হয়ে যায়। এত চেষ্টাচরিত্র সত্ত্বেও কোথাও পছন্দমত একটা ভালো পার্ট পায় নি। এমন সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ পার্ট বেছে বেছে তাকে দেওয়া হয়েছে যাতে কৃতিত্ব দেখাবার কোন সুযোগ পায় নি নিমাই। শেষ পর্যন্ত অযোগ্যতার অখ্যাতি ঘাড়ে নিয়ে সরে এসেছে। অবশ্য সব সময়ে যে ঘাড় গুঁজে মুখ বুজেই চলে এসেছে তা নয়, ঝগড়াঝাটি করেছে। আস্তিন গুটিয়ে দু একবার হাতাহাতি করতেও বাকি রাখে নি। সিনেমা জগতের অবস্থাও এর চেয়ে ভালো নয়। ডিরেক্টারদের মিথ্যা আশ্বাসে দিনের পর দিন ঘুরেছে। কোথাও একটা ভালো চান্স পায়নি। যে দু একখানা ছবিতে ছোটখাট সুযোগ পেয়েছে সেগুলির কাজ শুরু হতে না হতেই বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ এই অভিনয়টাই যত্ন করে এতদিন ধরে শিখেছে নিমাই। অভিনেতা হওয়া ছাড়া জীবনে সে আর কিছু চায় নি। আজও তার দ্বিতীয় কোন কামনা নেই। তবু কিছুই হচ্ছে না। শুধু সে নিজের মধ্যে নিজে জ্বলে পুড়ে মরছে। কপাল কথাটা উচ্চারণ করতে ইচ্ছা হয় না। তবু বাধ্য হয়ে করতে হয়। বড় বড় লোকের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে ছোট আর মাঝারিরা উপহাস করে। তার চেয়ে তিন অক্ষরের চার আঙুল পরিমিত স্থানটুকুকে সব দুঃখের খনি বলা নিরাপদ।

আমি ধৈর্য ধরে সব শুনলাম, তারপর সহানুভূতি জানিয়ে

নিমাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি বল।'

নিমাইর ধারণা আমি অনেক কিছুই করতে পারি। কারণ মঞ্চ আর চিত্র জগতের সঙ্গে আমার এতদিনে পরিচয় হয়ে গেছে। কিন্তু সে আমাকে বেশি কিছু করতে বলে না। আমার আত্মসম্মান যাতে ক্ষুণ্ণ হয় তেমন কিছু তো নয়ই। দু' একখানা চিঠি লিখে আমি যেন এমন কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে নিমাইর পরিচয় করিয়ে দিই যাতে সত্যিই কাজ হবে।

আমি একটু ভাবনায় পড়ে গেলাম। কিন্তু নিমাই নাছোড়-বান্দা। কোন ওজর আপত্তিই সে মানল না। জন দুই ডিরেক্টরের কাছে পরিচয় পত্র লিখে দিলাম। ছেলেটি যদি কোন সুযোগ সুবিধা পায় আমার ব্যক্তিগত উপকার হবে এমন কথাও জানালাম।

এরপর অন্দরমহলে ঢুকল নিমাই। আমার স্ত্রী রেখা ওদের গ্রামের মেয়ে। সেই সুবাদে রেখাদি। তার সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে গল্প সল্প করল; চা খাবার খেল। যাওয়ার সময় ফের একবার আমার সঙ্গে দেখা করে বলে গেল, 'কল্যাণদা, মনে রাখবেন আমার কথা।'

আমি তখন আমার নতুন গল্পের নায়িকাকে নিয়ে ব্যস্ত। কোন রকমে মাথা নাড়লাম।

তারপর থেকে নিমাই দু' তিন সপ্তাহ অন্তর অন্তর আমার কাছে আসতে লাগল। আমার সুপারিশ চিঠিতে সদ্য সদ্য কোন কাজ হয়নি। তাঁরাও নিমাইকে ভবিষ্যতের আশ্বাস দিয়েছেন। সে ভবিষ্যৎ যেমন দূরবর্তী তেমনি অনিশ্চিত তবু নিমাই আমার কাছে যাতায়াত করে। একদিন কথায় কথায় সে বল্ল, 'আপনি কোন সংকোচ করবেন না কল্যাণদা। আপনি সাধ্যমত করেছেন। তাই বা কয়জনে করে। দুনিয়ায় সহানুভূতিটাই সব কল্যাণদা। তার চেয়ে বড় কিছু নেই।'

আরো অনেক বড় বড় কথা বলে নিমাই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নাটকের দৈন্য নিয়ে দুঃখ জানায়। অভিনয় শিল্পের সমালোচনা করে। আগের তুলনায় অভিনয়ের মান যে নেমে যাচ্ছে, আর্টিস্ট-দের মধ্যে নিষ্ঠার অভাব দেখা যাচ্ছে নানা প্রমাণ প্রয়োগে বোঝাতে চায়। আমি তর্কে কি আলোচনায় যোগ দিই না। একবার হাঁ করি আর একবার হুঁ করি। তারপর একদিন বিব্রত আর বিরক্ত হয়ে বললাম, 'নিমাই, তুমি বরং তোমার রেখাদির কাছে যাও। থিয়েটার সিনেমার ব্যাপারে সে আমার চেয়ে বেশি উৎসাহী। বোঝে শোনেও যথেষ্ট। তার সঙ্গে আলাপ করে তুমি আরাম পাবে।'

নিমাই একটুকাল স্তম্ভিত হয়ে থেকে বলল, 'আপনার লেখার ব্যাঘাত করলাম বুঝি। আমি বুঝতে পারি নি কল্যাণদা। আপনার দোষ নেই। রিহার্সেলের সময় কেউ যদি ডিস্টার্ব করে আমারও ঠিক এই রকমই মেজাজ বিগড়ে যায়।' তারপর একটু হেসে বলল, 'সব আর্টিষ্টেরই প্রায় একই ধাত।'

মাস তিনেকের মধ্যে নিমাইর আর দেখা সাক্ষাৎ নেই। আমার সেদিনকার ব্যবহারে ও ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হল। রেখা বলল, 'তা রাগ তো করতেই পারে। বোকা ছেলে তো আর নয়।'

বললাম, 'তোমাদের গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা আবার বোকা হয়েছে কবে।'

রেখা বলল, 'তা ঠিক! এ ব্যাপারে তোমাদের গাঁয়েরই কৃতিত্ব বেশি।'

তিন মাস পরে একদিন সন্ধ্যায় ফের নিমাই এসে হাজির। একা নয়, আর এক বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। বন্ধুটি নিমাইর চেয়ে বছর কয়েকের বড়ই হবে। নিমাই পরিচয় করিয়ে দিল। তরুণ নাট্যকার সঞ্জয় সেন। ওর নাটকই এবার নিমাইরা নাট্যচক্রের পক্ষ থেকে অভিনয় করবে। রিহার্সেল নিয়ে এতদিন ব্যস্ত ছিল বলেই নিমাই এতদিন আসতে পারে নি। সঞ্জয় বাবু এবার ওদের ক্লাবের

প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। অভিনয়ের খরচটা অনেকখানি তিনিই বহন করবেন। এর আগে পুরোন নাটকের, বিশেষ করে পাবলিক স্টেজে যে সব নাটক জনপ্রিয় হয়েছে সেগুলির অভিনয় করেছে নিমাইরা। কিন্তু মাঝে মাঝে নতুন নাটক নিয়ে যদি পরীক্ষা নিরীক্ষা না করা যায় তাহলে নতুন সৃষ্টি হবে কোত্থেকে।

নিমাইর আবেদন, 'আমাকে তাদের নাট্যানুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে হবে। রবিবার সন্ধ্যায় তাদের ওখানে সস্ত্রীক যেতে হবে আমাকে।

আমি বললাম, 'এই তো মুস্কিলে ফেললে নিমাই। রবিবার যে আমি অন্য যায়গায় যাব বলে কথা দিয়েছি।'

নিমাই মৃদু হেসে বলল, 'আপনার এড়াবার মতলব কল্যাণদা। সাহিত্যিকদের ওসব কায়দাকানুন আমার খুব জানা আছে।'

বললাম, 'বিশ্বাস না হয় আমি তোমাকে ডায়েরির পাতা খুলে দেখাতে পারি।'

নিমাই জিভকেটে বলল, 'ছি ছি ছি। আম ঠাট্টা করছিলাম কল্যাণদা। আপনাকেও যদি অবিশ্বাস করব তাহলে দাঁড়াব কোথায়।'

শেষ পর্যন্ত স্থির হল আমি শুধু উদ্বোধন করে দিয়েই চলে আসব। বেশি সময় আমাকে দিতে হবে না। নিমাইরা বরং আমাকে দ্বিতীয় গন্তব্য টালিগঞ্জ তরুণ সমিতিতে পৌঁছে দেবে।

নির্দিষ্ট দিনে নিমাইদের গাড়ি এসে হাজির হল। সে নিজে আসতে পারে নি। তার খুড়তুতো ভাই শ্যামলকে পাঠিয়েছে। ছেলেটি সবে স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে কলেজে ঢুকেছে।

যাওয়ার সময় স্ত্রীকে বললাম, 'তুমিও আসবে নাকি? অত করে বলে গেছে! তোমাদের দেশের ছেলের থিয়েটার।' কিন্তু রেখা রাজী হল না। তারও অন্য কাজকর্ম আছে।

গাড়িতে যেতে যেতে শ্যামলের কাছ থেকে অনেক কথাই শুনলাম। নিমাইর ওপর তাদের বাড়ীর সবাই অপ্রসন্ন। এত সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও পড়াশুনা করল না। মন দিয়ে যে চাকরি বাকরি করবে

তাও নয়। আজ এখানে কাল সেখানে। মাইনেপত্র যা পায় তার বেশির ভাগই নানা খেয়ালে ওড়ায়। বিশ পঁচিশ টাকার বেশি দিতে পারে না। কোত্থেকে দেবে। ক্লাবের চাঁদা দিয়ে কিছু থাকলে তো। বছরে খান চারেক ক'রে নিমাইদের নাটক হয়। সারা বছর ধরে সেই খরচের জের চলে।

মাণিকতলায় ঢুকে শ্যামল বলল, 'নিমাইদাদের ফাংশন আরম্ভ হওয়ার অনেক দেরি আছে। আপনি আমাদের বাড়ি একবার হয়ে যান। জ্যেঠামশাই অনেক ক'রে বলে দিয়েছেন।'

আঁকাবাঁকা সরীসৃপ গলি। অতিকষ্টে ট্যাকসি ঢুকল। পুরোন একটা বাড়ির সামনে এসে শ্যামল ড্রাইভারকে বলল, 'বাস।'

গোটা বাড়ী লীজ নিয়ে একতলাটা শুনলাম ভাড়া দিয়েছেন নিমাইর বাবা জিতেন রায়। কিন্তু এখন ওপরের চারখানা ঘরে নিজেদের স্থান সংকুলান হওয়া শক্ত। কিন্তু না কুলালেই বা উপায় কি। বাড়িভাড়ার খাতে যদি খরচ আরো বেড়ে যায় তাহ'লে আর রোজ বাজার হবে না। বউদের শাড়ি জুটবে না। ছেলেপুলেদের স্কুলের মাইনে বাকি পড়ে থাকবে।

সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এসে জিতেন কাকা আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, 'এসো এসো।'

বেশ বুড়ো হয়ে পড়েছেন। ষাট বাষট্টি হবে বয়স। মাথার চুল সব পাকা। বয়সের তুলনায় শরীর আরো জীর্ণ হয়ে পড়েছে। হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছেন অনেক দিন ধরে। তিনি আমাকে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে বসালেন।

একদিকে তাঁর বিয়েতে যৌতুক পাওয়া খাট আলমারী। বহুদিন পালিশ না পড়ায় জিনিষগুলি বিবর্ণ হয়ে গেছে। আর একদিকে ট্রাঙ্ক স্যুটকেসের সারি, কাপড়চোপড় রাখবার সস্তা আলনা। গৃহস্থালীর জিনিষপত্রে ঘরখানা একেবারে বোঝাই। মেঝেয় এরই মধ্যে বিছানা পড়েছে। সেখানে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা শোবে।

সেই বিছানার পাশ দিয়ে আমরা খাটের ওপর গিয়ে বসলাম। জিতেন কাকা মিনিটখানেকের মধ্যে কুশল প্রশ্ন শেষ করে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বুঝি ওদের ওখানে সভাপতি হয়ে এসেছো?' তাঁর ঠোঁটে হাসি, কণ্ঠে শ্লেষ।

আমি অপরাধীর ভঙ্গিতে বললাম, 'না না ঠিক সভাপতি নয়—।'

তিনি বললেন, 'আরে, ওই হল, ওই হল। সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট অতিথি। কত রেওয়াজই হয়েছে আজকাল। কালে কালে কতই দেখবো।'

তারপর আস্তে আস্তে নিমাইর প্রসঙ্গ তুললেন। শ্যামল যা বলেছিল তারই রাজ সংস্করণ। নিমাইকে নিয়ে তাঁদের অশান্তির শেষ নেই। পরিবারের সুখ দুঃখ অসুখ বিসুখ কিছুরই ধার ধারবে না নিমাই। তার আড্ডা আর থিয়েটার নিয়ে আছে। পাড়ার যতসব বদ্ আর বকাটে ছেলেদের সঙ্গে ওর মেলামেশা। তাদের দলপতি।

জিতেনকাকা বললেন, 'ভেড়ার দলে বাদুড় পরামাণিক হয়েছেন উনি। ওই ছেলেকে নিয়েই সংসারে যত অশান্তি, ভায়ের সঙ্গেই মন কষাকষি। বড় ছেলের সঙ্গে ঝগড়া। এত করে বলি দূর হয়ে যা এখান থেকে। তোর মুখ দেখতে চাইনে। কিন্তু দেহে লজ্জা ঘৃণা বলে তো কোন পদার্থ নেই বাবা। তাই তাড়িয়ে দিলেও কুকুরের মত ফের আসে। শুনেছি তোমার কাছে নাকি প্রায়ই যায়। তোমার পরামর্শ টরামর্শ শোনে, তুমি একটু বুঝিয়ে শুনিয়ে বোলো। বাপের গোয়াল তো আর চিরকাল থাকে না। আমি চোখ বুজলে কি উপায় হবে সে কথা যেন একবার ভাবে। তাও যদি চাকরি বাকরি করতে পারতাম এত ভাবনা ছিল না। পেনসনের কটা টাকা। কি হয় ওতে!'

বললাম, 'কেন আপনার ভাই মানে সত্যেনকাকা! তারপর নিতাইও তো বেশ ভালো চাকরিই করে এ জি বেঙ্গলে।'

জিতেনকাকা বললেন, 'হ্যাঁ করে সবাই। কিন্তু মাস অন্তে আমার হাতে কিই বা এসে পৌঁছায়। আজকালকার জয়েন্ট ফ্যামিলির ধরণই আলাদা। কেবল নামেই জয়েন্ট। যাক ওসব কথা আর একদিন বলব। তোমার আবার তাড়া আছে। তা থিয়েটার সিনেমা করতে চায় তাই করুক। যেমন করে হোক টাকা আনতে পারলেই হল। কোন কোম্পানী টোম্পানীতে দেওনা ঢুকিয়ে! হতভাগার চেহারা টেহারা আছে। গলাটাও একেবারে মন্দ নয়।'

এতক্ষণে বাৎসল্যে একটুখানি স্নিগ্ধ হল জিতেন কাকার, মুখ। তিনি মৃদু হাসলেন।

বললাম, 'আপনাকে বলতে হবে না কাকা। নিমাইর জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

সঙ্গে সঙ্গে ডিরেক্টর ব্যানার্জীর কথা আমার মনে পড়ল। তাঁর সঙ্গে কয়েকদিন আগে দেখা। নিমাইর কথা ওঠায় তিনি হেসে বলেছিলেন, 'আচ্ছা এক চীজ পাঠিয়েছিলেন মশাই, কি সব লম্বা চওড়া কথা। ওকে আমি শেখাব কি। ওই আমাকে সাতজন্ম শেখাতে পারে।'

জিতেনকাকার কাছ থেকে বেরিয়ে এলাম। নিতাইর সঙ্গে দেখা হল না। ছুটির দিন পেয়ে কন্যাকলত্র নিয়ে সে ব্যারাকপুর শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গেছে। রঙ্গালয়ের চেয়ে শ্বশুরালয়ের ওপর তার আকর্ষণ বেশি।

সদর দরজার কাছে নিমাইর মা এসে দাঁড়ালেন. তাঁর চুল তেমন পাকে নি, দাঁত পড়েছে বেশি। এতক্ষণ রান্নাঘরে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের খাওয়া দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তারা সকাল সকাল খেয়ে থিয়েটার দেখতে যাবে। আমি চলে যাচ্ছি শুনে তাড়াতাড়ি এলেন দেখা করতে।

বললাম, 'কেমন আছেন বড় কাকিমা?'

তিনি বললেন, 'আর বাবা, আমাদের আবার থাকাথাকি। তুমি এখনই চলে যাচ্ছ? আমার যে অনেক কথা ছিল তোমার সঙ্গে।'

বললাম, 'আর একদিন এসে শুনবো কাকিমা। ওদিকে বুঝি নিমাইদের থিয়েটার শুরু হয়ে গেল। না গেলে রক্ষা রাখবে না।'

কাকিমা হেসে বললেন, 'যাবে বৈকি, নিশ্চয়ই যাবে। তোমার কত গল্প এসে আমার কাছে করে। জিজ্ঞেস করলে বোলো সব সেরে টেরে যদি সময় পাই আমিও যাব একবার। থিয়েটার ফিয়েটার হলে বাড়ীর আর কেউ যাক আর না যাক আমি না গেলে ছেলের মুখ ভার। ওই সং আমাকে বসে বসে দেখতে হবে। আজও বলে গেছে তুমি কিন্তু যেও মা। কিন্তু যাবো যে, কি করে যাবো। ছোটজা পোয়াতী, শরীর খুবই খারাপ। বাড়ীতে একপাল ছেলেমেয়ে। এর অসুখ, তার বিসুক। তারপর ঘরের কর্তাটির যা মেজাজ।'

শ্যামল তাগিদ দিয়ে বলল, 'আসুন কল্যাণদা।'

রঙ্গস্থলীতে গিয়ে পৌঁছতে তিন চার মিনিটের বেশি লাগল না। জায়গাটা নাকি ছিল এক জমিদারের বাগানবাড়ি। এখন বাগানও নেই, বাড়িও গেছে। তবু ওরই মধ্যে ষ্টেজ বেঁধে দর্শকদের জন্যে প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছে। কিছু নতুন চেয়ার ভাড়া করেছে। পাড়ার হাইস্কুলের সেক্রেটারীকে বলে টলে, কিছু বেঞ্চও জোগাড় করেছে নিমাই। পাড়ার রাজ্যের সব ছেলেমেয়ে এরই মধ্যে সেগুলি ভরে ফেলেছে। আসতে আসতে শ্যামলের কাছে সব খবরই শুনলাম।

নিমাই গ্রীণরুমে সাজসজ্জা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। খবর পেয়ে আমাকে এসে অভ্যর্থনা করল, 'আসুন, আসুন।' বললাম, 'আসব কিন্তু বসতে পারব না। এখনো তো তোমাদের ঢের বাকী মনে হচ্ছে। সাড়ে ছটায় সময় দিয়েছিলে এখন প্রায় আটটা বাজে।'

নিমাই লজ্জিত হয়ে বলল, 'এসব জায়গায় এই রকমই হয় কল্যাণদা। কি করব বলুন, যেদিকে না যাব সেইদিকেই গোলমাল বাধবে। বলতে নেই, একাই আমাকে সবদিক সামলাতে হচ্ছে।

এখনো লাইট ফাইট কিছু ঠিক হয় নি। যে মাইকটা ওরা এনেছেন, তাতে কাজ হচ্ছে না। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। এত চেঁচিয়েছি, বকাবকি করেছি যে শেষ পর্যন্ত ভাঙা গলা নিয়ে পার্ট করতে হবে।'

বললাম, 'কিন্তু আমাকে যে আর এক জায়গায় যেতে হবে। আমি বরং তরুণ সমিতিটা সেরে আসি।'

নিমাই বলল, 'তা হ'লে আমাদের অবস্থাটা আরো করুণ হয়ে পড়বে কল্যাণদা। দয়া করে আপনি উদ্বোধনটা করে দিয়ে যান। তারপর সারারাত আছে আর আমরাও আছি। আপনি ভাববেন না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

পাঁচ মিনিটের জায়গায় পনের মিনিট লাগল। নিমাইয়ের সেই নটবর বেশ এখন আর নেই। কাপড় মালকোচা করে পরা। গায়ে একটা হাফ সার্ট। ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকি করে যা হোক একটা ব্যবস্থা করে ফেলল। অনুষ্ঠানের সভাপতি আর প্রধান অতিথি দুইজনেই পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তি। একজন কর্পোরেশনের কাউনসিলার আর একজন প্রবীণ ডাক্তার। দুইজনেই নাট্যচিত্রের পৃষ্ঠপোষক। নিমাই এঁদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিল। আর একটি মেয়ের সঙ্গেও পরিচয় করালো। ঝর্ণা সরকার। উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবে। বছর উনিশ-কুড়ি হবে বয়স। শ্যামবর্ণ লম্বা রোগাটে চেহারা। তবে ওরই মধ্যে চোখ মুখের শ্রীটুকু মন্দ নয়। সে মাইকের সামনে হার্মোনিয়ম নিয়ে বসে গান ধরল, 'লহ লহ তুলে লহ, নীরব বীণাখানি।' গলা না ভালো না মন্দ গোছের।

গানের পরে সেক্রেটারীর বার্ষিক বিবরণী। নিমাই-ই দেখলাম এ বছরের সেক্রেটারীর পদ পেয়েছে। হাফ সার্ট ছেড়ে পরে এসেছে খদ্দরের পাঞ্জাবি। কাঁদে সোনালি পাড় দেওয়া চাদর।

নিমাইর পরে আমার পালা। কিন্তু কি বলব। এদের নাটক কি নিয়ে তা জানিনে, বিষয়বস্তু কিছু শুনিনি। দ্বিতীয় সমস্যা কাদের

কাছে বলব। সামনের বেঞ্চগুলিতে কলরবমুখর শিশুরা বসে আছে, পিছনের বেঞ্চগুলি ফাঁকা। দর্শক দর্শিকারা কেউ এখনো এসে পৌঁছান নি। বক্তৃতা শেষ হবার পর নাটক আরম্ভ হলে তাঁরা আসবেন। তবু অনাগত সেই শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আধুনিক বাংলা আর নাট্যজগতে সৌখীন অভিনেতাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে কর্তব্য শেষ করলাম।

নিমাই আমাকে সাজ ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। জলযোগ করাবে। বলল, 'ঝর্ণা, কল্যাণদাকে চা আর খাবারের প্লেটটা ধরে দাও। ও দুঃখ করছিল কল্যাণদা। আপনি ওর অভিনয়টা দেখে গেলেন না। অন্তত কিছুক্ষণ যদি থেকে যেতেন। প্রথম দুটো সীনের পরেই ওর 'appearance'। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম,'উনি অভিনয়ও করবেন নাকি? এখানে কি মেয়েদের রোলগুলি মেয়েরাই করবে?' নিমাই উল্লসিত হয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই। আপনি ভেবেছেন কি আমাদের? গোঁফচাঁছা ছেলেদের দিয়ে মেয়েদের পার্ট করাব? সেই যুগ কি আর আছে নাকি!'

বললাম, 'এঁরা কি সব তোমাদের পাড়ার?'

নিমাই বলল, 'না না, অন্য পাড়ার। এঁরা সব প্রফেসনাল আর্টিষ্ট। পাড়ার বন্ধুবান্ধবের স্ত্রী বোনেরা যদি এগিয়ে আসতেন তা হলে তো পয়সাই লাগত না। কিন্তু সে কথা কি উচ্চারণ করবার জো আছে? ওরে বাপরে। মেরেই ফেলবে একেবারে। এদের কত টাকা দিয়ে আনতে হয় কল্যাণদা। পার নাইট কারো দশ কারো পনের বিশ পর্যন্ত উঠেছি। তার বেশি আর পারি নে। সামলানো কি সোজা কথা। চাঁদা তুলে আর দু' আনা চার আনা দামের টিকেট বিক্রয় করে কতই বা ওঠে। কই ঝর্ণা, ওঁকে চা-টা দাও, ওঁর আবার তাড়া রয়েছে।' ঝর্ণা এগিয়ে এসে ছোট টেবিলটির ওপর চায়ের কাপটি রাখল।

আমি বললাম, 'আপনিই বুঝি heroine-এর পার্ট করছেন?'

ঋণা মুহূর্তের জন্য চোখ নামিয়ে নিল। তারপর ফের মুখ তুলে মৃদু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলল, 'আপনি ঠাট্টা করছেন। আমি কি heroine হবার মত? Heroine-এর পার্ট করছেন কাকলীদি! ওপাশে make-up করছেন। আপনি কি তাঁর সঙ্গে আলাপ করবেন?' বললাম, 'না, আজ আর সময় নেই। আমাকে এখুনি উঠতে হবে।'

নাটকের আরো কয়েকটি চরিত্র ঘরের ভিতর দিয়ে ব্যস্ত ভাবে যাতায়াত শুরু করল। নকল গোঁফ আর পরচুলা পরা একটি ছেলে নিমাইকে লক্ষ্য করে বলল, 'আর বসে বসে গল্প করবেন না নিমাইদা। মেক-আপটা তাড়াতাড়ি সেরে নিন। এর পর অডিয়েনসকে সামলানো যাবে না।'

আমি এবার উঠে দাঁড়ালাম। তারপর নিমাইর ভূমিকা সম্বন্ধে একটু ঔৎসুক্য দেখিয়ে বললাম, 'তুমি কিসের পার্ট করছ? হিরোর?'

নিমাই একটু হেসে বলল, 'হিরো আর হিরোইন ছাড়া আপনি বুঝি আর কিছু জানেন না কল্যাণ দা? না হিরো নয়, আমি করছি ভিলেনের পার্ট। বাড়ি শুদ্ধু আমাকে তো তাই বলেই জানে। আমাদের বাড়ির কেউ বোধহয় এই থিয়েটার দেখতে আসবে না। না আসে না আসুক কল্যাণদা। আরো কতজনে আসবে।' একটু থেমে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে নিমাই ফের বলতে লাগল, 'আশে পাশের বস্তিগুলো থেকে লোকজন এসে ভেঙে পড়বে। আমাদের নাটক আমাদের অভিনয় ওদের জন্যই। চার আনা আর দু আনার টিকিট আছে। খরচ তুলবার জন্যে কিছু টিকিটের ব্যবস্থা রাখতে হয়। কিন্তু প্রথম অঙ্কের পর আমরা গেট ছেড়ে দিই। বিনা টিকিটের দর্শকরা এসে প্যাণ্ডেল ভরে ফেলে। বিনা পয়সায় থিয়েটার দেখতে পেয়ে কি যে খুসি হয় তারা। পাড়ার বউ ঝিরা আসেন। তাঁদের জন্যে আলাদা

বসবার জায়গা করে দিয়েছি। ষ্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে যারা এ্যাকট করছে তারা এইসব বউ-ঝিদের কারো স্বামী, কারো ভাই, কারো ছেলে। কি রোমঞ্চকর ব্যাপার একবার ভেবে দেখুন। এখানকার এই আনন্দ এই রোমাঞ্চের সঙ্গে কি কোন পাবলিক ষ্টেজের তুলনা হয়? চলুন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি কল্যাণদা।'

দিন দুই পরে নিমাই নিজেই অনুষ্ঠানের রিপোর্ট নিয়ে এসে উপস্থিত হল আমাদের দৈনিক কাগজের অফিসে। বলল, 'আপনাদের সিনেমার পেজে খবরটা যাতে তাড়াতাড়ি বের হয় তার ব্যবস্থা করে দেবেন।'

রিপোর্ট পড়ে দেখলাম অভিনয় খুব চমৎকার হয়েছে। সকলেই সুঅভিনয় করেছেন। তার মধ্যে শ্রীনিমাই রায়, শ্রীমতী কাকলী দাস, ঝর্ণা সরকার, ছন্দা চক্রবর্তীর অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হেসে বললাম 'হাতের লেখা তো দেখছি তোমার। নিজের নামটা নিজেই বসিয়ে এনেছ নাকি নিমাই?'

নিমাই একটু লজ্জিত হল। কিন্তু পর মুহূর্তেই বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গীতে বলল, 'জানেনই তো কল্যাণদা, যুগটাই হল পাবলিসিটির। যে যত ঢাক পেটাতে পারবে তার তত নাম। এখনো তো তেমন হোমরা চোমরা হ'তে পারি নি যে পয়সা দিয়ে ঢুলী পুষব। তাই যখন সুযোগ সুবিধে পাই নিজের ঢোল নিজেই পেটাই।'

মাসখানেক বাদে নিমাই ফের একদিন আমাদের বাসায় এল। একথা ওকথার পর সে একটু ভাণিতা ক'রে বলল 'কল্যাণদা আজ নিজের জন্যে আসি নি, আর একজনের জন্যে তদ্বির করতে এসেছি।'

বললাম, 'কে? তোমার বন্ধু টন্ধু নাকি?'

নিমাই বলল 'না, বন্ধু ঠিক নয়। ওই যে ঝর্ণা বলে

একটি মেয়ের সঙ্গে সেদিন পরিচয় করিয়ে দিলাম তার কথা বলছি। জানেন মেয়েটির মধ্যে পার্টস আছে? একথা শুধু আমি বলছি, ভাববেন না। সেদিন আপনার তো সময় হল না। শুধু একটা গান শুনলেন। কিন্তু গান তো ওর নিজের লাইন নয়, ওর নিজের আর্ট অভিনয়। আপনি ওর অভিনয় দেখলে খুসি হতেন।'

বললাম, 'খুসি আমি না দেখেও হয়েছি। এবার ব্যাপারটা কি বল।'

'ব্যাপার আর কিছুই নয়, থিয়েটার হোক, সিনেমায় হোক ঝর্ণার একটা সুযোগ সুবিধে করে দিতে হবে। গোড়ার দিকে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ব্যাকিং চাই, নইলে কেউ দাঁড়াতে পারে?'

মনের বিরক্তি যথাসাধ্য চাপতে চেষ্টা করে বললাম, 'নিমাই, নিজে আগে দাঁড়িয়ে নাও, তারপর অন্যের জন্য সুপারিশ কোরো। নিজে ক্ষমতাবান না হতে পারলে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কারোরই উপকার করা যায় না। তা ছাড়া একবার সংসারের দিকেও তো তোমার মন দেওয়া দরকার। তোমার বাবা সেদিন কত দুঃখ করলেন।'

নিমাই আর কোন কথা না বলে চুপচাপ গম্ভীরভাবে বসে রইল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার একটু মায়া হল। গলাটা নরম ক'রে বললাম, 'তাছাড়া actingকেই তুমি যদি career হিসেবে নিতে চাও, তার জন্যে তোমাকে তৈরী হ'তে হবে। পড়াশুনো করতে হবে। দেশী বিদেশী ভালো ভালো সিনেমা নিয়মিত দেখবে। সবচেয়ে ভালো হয় যদি কোন বড় অভিনেতার সঙ্গে কিছুদিন থাকতে পার।'

নিমাই সখেদে বলল, 'তাই তো ইচ্ছা ছিল কল্যাণদা, কিন্তু সময় আর সুযোগ তেমন হল কই। আমার কথা থাক। নিজের

ভাবনাতো চিরকালই আছে। ঝর্ণার যদি একটা সুবিধা সুযোগ হয়ে যেত। ওর বিশেষ দরকার কল্যাণদা। অভিনয় আমাদের নেশা। কিন্তু ঝর্ণার তা নয়। অভিনয় একই সঙ্গে ওর নেশা এবং পেশাও।'

একটু কৌতূহল প্রকাশ করতেই নিমাই ঝর্ণাদের কথা সব খুলে বলল। কয়েক বছর আগে নিমাইর এক সময় তবলা শেখার শখ হয়েছিল। তবলচী ননীগোপাল সরকার থাকতেন তখন নেবুতলায়। তাঁর ওখানে যেত সাকরেদী করতে। ভদ্রলোক তখন একটা ফ্লাট ভাড়া নিয়ে থাকতেন। চাকরি করতেন সরকারী অফিসে। অবসর সময়টায় গীত বাদ্যের চর্চা চলত। কিন্তু নিমাইর সঙ্গে যখন থেকে ওঁদের পরিচয় তখন সুখের সংসারে ভাঙন ধরেছে। ননীগোপাল চূড়ান্ত মাতাল হয়ে ফিরতেন। স্ত্রীকে মারধর করতেন। ঝড়ে পড়া ভীরু পাখীর মত ঝর্ণা সেই সময় ঘরের কোণে আশ্রয় নিত। কিন্তু ঝড়ের প্রচণ্ডতা আর পরিমাণ দুইই ক্রমে বাড়তে লাগল। নিমাইর সামনেই ননীবাবু তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতেন তাঁকে মারতে যেতেন। অবশ্য তাঁর স্ত্রীও যে একেবারে প্রশান্তির প্রতিমূর্তি ছিলেন তা নয়। অমনি এক ঝগড়ার দিনে নিমাই জানতে পারে যে ঝর্ণার মা ননীবাবুর বিবাহিতা স্ত্রী নয়। কিন্তু একথা জানবার পর নিমাইর মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয় নি। কারণ এর চেয়েও প্রচণ্ড ঝগড়া আর মারামারি সে বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যেও হতে দেখেছে।

তারপর মত্ত অবস্থায় আকস্মিক ভাবেই একদিন মারা যান ননীবাবু। তার আগেই অবশ্য তবলা শেখার শখ নিমাইর চলে গিয়েছিল। সে তখন থিয়েটার নিয়ে মেতেছে।

বছর দুই বাদে ঝর্ণার মা নির্মলাই একদিন খবর দিলে নিমাইকে। ফ্লাট বাড়ি ছেড়ে দিয়ে তাঁরা তখন উল্টাডিঙির এক

গলির মধ্যে বাসা নিয়েছেন। পুরোন একতালা বাড়ি। একখানা মাত্র ঘর নিয়ে মা আর মেয়ে থাকেন। ঝর্ণার মা সেলাইর কাজ চালান। জামা প্যাণ্ট ফ্রক তৈরী করে বিক্রি করেন। ভেবেছিলেন মেয়ে তাঁকে সাহায্য করবে। কিন্তু ঝর্ণার সেলাইর কাজে মোটেই উৎসাহ নেই। পড়াশুনোতেও আগ্রহ কম। থার্ডক্লাসে একবার ফেল করে ওপাট চুকিয়ে দিয়েছে। ওর ঝোঁক অভিনয়ের দিকে। স্কুলে যখন পড়ত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বহুবার পুরস্কার পেয়েছে; স্কুলের ফাংশনে মেয়েরা যেসব অভিনয় করত তাতে ঝর্ণার একটি বিশেষ স্থান ছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর সেই বিদ্যাকে ঝর্ণা কাজে লাগাল। কলকাতার আশেপাশে সহরতলীতে যেসব এ্যামেচার ক্লাব আছে তাদের ডাকে সাড়া দিল ঝর্ণা। প্রথম প্রথম নির্মলা মেয়েকে ছাড়তে চাইতেন না। কিন্তু যখন কাটা কাপড়ের ব্যবসা চলল না আর ঝর্ণা থিয়েটার করে মাঝে মাঝে দশ পনের টাকার আমদানী করতে লাগল তখন আর তেমন বাধা দিলেন না। কিংবা বাধা দিলেও ঝর্ণা শুনল না। এখন ঝর্ণার ইচ্ছা হয়েছে ছোট ষ্টেজ ছেড়ে বড় ষ্টেজে নামবার। সিনেমায় সুযোগ পেলে আরো ভালো হয়। নিমাই তো এ লাইনে আছে। বহু জায়গায় বহু লোকের সঙ্গে তার আলাপ। সে যদি ঝর্ণার একটা সুযোগ সুবিধা করে দিতে পারে তা হলে ঝর্ণার মা খুবই উপকৃত হন। নিমাইয়ের বোলচাল আর চালচলন দেখে তাকে যতটা ক্ষমতাবান বলে মনে করেছিলেন সে অবশ্য বেশীদিন সেই আস্থা বজায় রাখতে পারেনি। তাই বলে ঝর্ণার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেনি নিমাই। ওকে সঙ্গে নিয়ে ষ্টুডিওতে ষ্টুডিওতে ঘুরেছে। বহু ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করেছে। কিন্তু কোন সুবিধা করে উঠতে পারেনি। ঝর্ণা সেই সৌখীন ক্লাবের দশটাকা মজুরীর অভিনেত্রীই রয়ে গেছে। এত চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই ওপরের শ্রেণীতে প্রমোশন পায়নি।

নিমাই বলল, 'কিন্তু কল্যাণদা, আপনি যদি ওর অভিনয় দেখতেন আপনাকে স্বীকার করতে হ'ত, হ্যাঁ, ওর পার্টস আছে। আপনার মনে হ'ত ওর জন্যে কিছু করা উচিত।'

বললাম, 'ওর অভিনয় না দেখেও সেকথা আমার মনে হয় নিমাই, ওর জন্যে তোমার জন্যে, এমন কি তোমাদের তুজনের জন্যে আমি কিছু করতে পারলে খুসি হতাম। কিন্তু সকলের সাধ্য তো সমান নয়। তাছাড়া ওসব লাইনের সঙ্গে আমার মোটেই তেমন যোগাযোগ নেই। এসব ব্যাপার নিয়ে আমার কাছে এসে তুমি আর সময় নষ্ট কোরো না।'

নিমাই খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'সত্যি, এতদিন ধরে আপনার অনেক দামী সময় নষ্ট করেছি। না জেনে না বুঝে আপনার কাছে অনেক অপরাধ করেছি কল্যাণদা। ছোট ভাই মনে করে মার্জনা করবেন।'

সেই যে নিমাই গেল তারপর মাস পাঁচ ছয়েকের মধ্যে এমুখো হল না। নিজের রূঢ় ব্যবহারের জন্যে আমি তু' একদিন লজ্জা বোধ করলাম। তারপর সব ভুলে গেলাম।

ছ'মাস বাদে নিমাই একদিন সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে এসে হাজির। মায়ামৃগ নামে একখানা ছবিতে ওরা তুজনেই চানস পেয়েছে। রবিবার সকালে ট্রেড শো। আমরা যেন অবশ্যই যাই।

রেখা বলল, 'এতদিন বুঝি সব চেপে রেখেছিলে! এই ছ'মাসের মধ্যে একবার দেখা সাক্ষাৎ নেই। একটা খবর পর্যন্ত দিতে আসনি। ভাবলাম কি হল নিমাইর।'

নিমাই হেসে বলল, 'ভাবনা চিন্তায় একেবারে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন, না রেখাদি? ঠিকানা তো দিয়ে গিয়েছিলাম, একবার তো খোঁজও নিলেন না, লোকটা আছে না ভবলীলা সাঙ্গ করে চলে গেছে।'

রেখা বলল, 'বালাই, চলে যাবে কেন। সত্যি কতদিন ভেবেছি যাই তোমাদের ওখানে। কিন্তু সংসারের এত ঝামেলা—পা বাড়াবার আর কি জো অছে।'

নিমাই স্বীকার ক'রে বললে, 'সবই বুঝি রেখাদি। যে যার ধান্দায় অস্থির। ইচ্ছা থাকলেও খোঁজ খবর নেওয়া হয়ে ওঠে না। যাবেন কিন্তু তুজনে। অবশ্য যাবেন।'

বললাম, 'কি রকমের পার্ট পেয়েছ?'

নিমাই একটু কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'সে বলবার মত নয় কল্যাণদা। তবে একেবারে ভীড়ের দৃশ্যেও ঠেলে দেন নি ডিরেক্টর। আলাদা ক'রে চিনতে পারবেন। মুখে কথাও কিছু আছে। ঝর্ণার ভাগ্য আমার চেয়ে একটু ভালো। হিরোইনের ছোট বোনের রোল পেয়েছে। এ্যাপিয়ারেন্সও কয়েকবার আছে। সেই চান্স ঝর্ণা পেল। কিন্তু ওর মা বেচারা দেখে যেতে পারলেন না।'

বললাম, 'কেন কি হয়েছে তাঁর?'

নিমাই বলল, 'মারা গেছেন। আজ আট দিন হল। জ্বরটা যে খারাপ দিকে যাচ্ছে আমি গোড়াতেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু পাড়ার ডাক্তার কিছুতেই অন্য ডাক্তারকে ডাকতে দিলে না পাছে নিজের বাহাতুরী নষ্ট হয়।'

একটু চুপ ক'রে রইল নিমাই। তারপর ধরা গলায় বলল, 'মেয়েটার আপন বলতে কেউ আর রইল না কল্যাণদা!'

অন্তত একজন যে আছে তা নিমাইর কথার ভঙ্গিতে টের পেলাম।

নিমাইর অনুরোধ সত্ত্বেও ওদের 'মায়া-মৃগ' আমরা দেখতে যেতে পারলাম না। রবিবার সকালে স্বামী পুত্র নিয়ে রেখার এক বান্ধবী এসে উপস্থিত। তাঁরা থাকেন দার্জিলিংএ। বাইরে থাকেন। কদিনের

জন্যে কলকাতায় বেড়াতে এসেছেন। যথোচিত আপ্যায়ন অভ্যর্থনা না করলে অকর্তব্য হবে।

রেখা আমাকে আড়ালে ডেকে বলল, 'তুমি বরং কার্ডটা নিয়ে যাও। দেখে এসো। নিমাই অত করে সেদিন বলে গেল।'

ভাবলাম স্ত্রীর এই অনুরোধ না রাখলেই সে বেশি খুশি হবে। বললাম, 'আর একদিন টিকেট কেটে দুজনে একসঙ্গে দেখব সেই ভালো।'

কাগজে 'মায়ামৃগে'র সমালোচনাও বেরোল। লেখক পরিচালক অভিনেতারা কেউ রেহাই পান নি, সবাই গাল খেয়েছেন। তবু এরই মধ্যে চলনসই অভিনয় যাঁরা করেছেন তাঁদের সঙ্গে ঝর্ণা সরকারের উল্লেখ আছে। কিন্তু নিমাইর নামগন্ধও কোথাও নেই। সে বোধ হয় এবার আর লিখবার সুযোগ পায় নি।

দু' সপ্তাহের বেশি চলল না ছবি। যাই যাই ক'রে আমাদের দেখা আর হল না। আগ্রহও যে বিশেষ ছিল তা নয়।

মাস দুই পরে সেদিন দুপুরবেলায় আমার বন্ধু নিতাই এসে আমাদের অফিসে হাজির। মুখখানা গম্ভীর। আমি তাকে আপ্যায়ণ করে আমার সামনের চেয়ারটায় বসতে দিয়ে বললাম, 'কি ব্যাপার! গরীবের দোরে হাতীর পদধূলি। অফিসার মানুষ একেবারে সশরীরেই এলে। বেয়ারার মারফৎও তো আসতে পারতে।'

নিতাই এসব ঠাট্টা পরিহাসের জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, 'তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।'

জরুরী কথা শুনলাম। নিমাই ঝর্ণাকে বিয়ে করেছে। সংবাদটা একেবারে যে অপ্রত্যাশিত তা নয়। তবে শুভ কাজটা যে এত তাড়াতাড়ি ঘটে যাবে তা ভাবতেই পারি নি। বাড়ির সবাই একবাক্যে বলছেন

ও ছেলের আর মুখদর্শন করবেন না। নিমাইর মা তাতে সায়ও দিচ্ছেন, কেঁদে-কেটে সবাইকে অস্থির করছেন আর নিজেও অস্থির হয়ে পড়ছেন। এমন কুলাঙ্গার ভাইয়ের খোঁজ নিতে নিতাই আসত না কেবল মায়ের কান্নাকাটির জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে তাকে আসতে হয়েছে। তারা কেউ নিমাইর ঠিকানা জানে না। অথচ ওদের প্রত্যেকের ধারণা আমি সব খোঁজখবর জানি। এমন কি আমার সাহায্য আর সমর্থনেই এ বিয়ে হ'তে পেরেছে। নিমাইর মা আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন আমি যেন তাঁদের এমন সর্বনাশ না ঘটতে দিই। এখনো বুঝিয়ে শুনিয়ে নিমাইকে যেন তাঁর কাছে পাঠাতে চেষ্টা করি।

আমি প্রতিবাদ করলাম। এসব ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও যে আমি জানিনে সেকথা বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু নিতাই তা পুরোপুরি বিশ্বাস করল বলে মনে হল না। যাওয়ার সময় বলে গেল, 'নিমাইর সঙ্গে দেখা হ'লে ব'ল ওই মেয়েটার সঙ্গে যদি কোন সম্পর্ক না রাখে তাহলে ফের আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারে। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ওকে আমরা ক্ষমা করতে রাজী আছি।'

আমি বললাম, 'আর বউয়ের কি হবে ?'

নিতাই মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'আরে ছেড়ে দাও, ওসব যাত্রা থিয়েটারের বউদের আমার জানা আছে। এক পালায় মাসী আর এক পালায় দাসী ওসব মেয়ের স্বামীর অভাব হয় নাকি ?'

বছর দেড়েকের মধ্যে কারোই আর কোন খোঁজ-খবর পেলাম না। ইচ্ছা করেই নিলাম না।

রেখাও বলল, 'দরকার কি। গেলাম না, খেলাম না, তা সত্ত্বেও যখন এত অপবাদ—'

ওর মত অপবাদের ভয় আমার অতটা নেই। কিন্তু সময়ের বড় অভাব। তবু সহরগুলির দু'একটা জায়গায় আরও দু'একবার এমেচার ক্লাবের অভিনয় দেখবার আমার উপলক্ষ ঘটল। অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে নিমাই আর ঝর্ণার মুখ খুঁজলাম। কিন্তু কাউকেই

দেখলাম না। জানিনে মেক-আপের আড়ালে তারা আত্মগোপন করে ছিল কি না।

তারপর সেদিন সন্ধ্যায় সতের আঠারো বছরের একটি ছেলের হাতে নিমাইর এক টুকরো চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, 'কল্যাণদা আজ তিন মাস ধরে রোগে শয্যাশায়ী। ঝর্ণার শরীরও খারাপ। দু'জনেই বেকার। গুটিদশেক টাকা যদি সন্তুর হাতে পাঠিয়ে দেন বড়ই উপকার হয়। সেরে উঠে যত তাড়াতাড়ি পারি আমি টাকাটা ফেরৎ দিয়ে আসব। প্রণাম জানবেন।'

টাকা সঙ্গে ছিল না। ছেলেটিকে তাই নগদ বিদায় করতে পারলাম না। বললাম, 'আমি নিজেই যাবো। ঠিকানা তো ওর চিঠিতেই আছে।'

সন্তুর মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল। বুঝতে পারলাম খালি হাতে ফেরার অভিজ্ঞতা ওর আরো হয়েছে। আলাপে টের পেলাম সন্তু নিমাইয়ের ভক্ত সাকরেদ।

সেদিন আর হয়ে উঠল না। পরদিন অফিসের পর খুঁজে খুঁজে বার করলাম নিমাইয়ের আস্তানা। খালের ওপারে ট্যাংরার এক বস্তীর মধ্যে ওরা আশ্রয় নিয়েছে।

ঘরে আসবাবপত্র প্রায় কিছুই নেই। মেঝেয় ময়লা বিছানা পাতা। দড়িতে খান দুই ছেঁড়া শাড়ি ঝুলছে। ছোট একটা হ্যারিকেন জ্বলছে মিটমিট করে।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কি নিয়ে যেন তুমুল তর্ক হচ্ছিল। আমি গিয়ে পড়ায় সেই দাম্পত্য কলহ থামল। দুইজনেই রুগ্ন, অভাবজীর্ণ, হয়ত অন্য কোথাও দেখলে চিনতেই পারতাম না। ওরা এক আচ্ছা মেকআপ নিয়েছে দেখছি!

নিমাই বলল, 'আপনি যে সত্যিই আসবেন তা ভাবতে পারিনি কল্যাণদা। ভেবেছিলাম আপনিও আর্টিষ্ট, আমিও আর্টিষ্ট। আপনি আমার অভিনয় দেখতেই যাবেন। কিন্তু দয়া ছাড়া আপনারা কিছু করতে জানেন না।'

বললাম, 'ওসব কথা পরে হবে নিমাই। তোমার অসুখটা কি তাই বল। কতদিন ধরে ভুগছ। চিকিৎসাপত্রের কি ব্যবস্থা হয়েছে?'

নিমাই বলল, 'অসুখের কারণটা তো বুঝতেই পারছেন কল্যাণদা। এর আর ব্যবস্থা কি হবে। ঝর্ণা ওঁকে এক কাপ চা করে দাও। উনি এই প্রথম এলেন।'

আমার নিষেধ সত্ত্বেও ঝর্ণা চায়ের আয়োজনে ভিতরে গিয়ে ঢুকল। ঘরের পিছনে একটু বারান্দার মত আছে। সেখানেই রান্না বান্নার ব্যবস্থা।

নিমাই আস্তে আস্তে সবই খুলে বলল। হ্যাঁ, বাড়ির সকলের অমতেই সে এ বিয়ে করেছে। সম্মতি নিতে চেষ্টা করে নি। কারণ চাইলেও পেত না। এমন কি ঝর্ণার মায়েরও এ বিয়েতে আপত্তি ছিল। তিনিও ওদের মেলামেশাকে ভাল চোখে দেখতেন না। বলতেন, 'এসব বিয়ের ফল শুভ হয় না।'

তিনি মারা যাওয়ার পর নিমাই ঝর্ণাকে বিয়ে করে। কারণ ওকে আশ্রয় দেওয়ার মত আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না। অথচ লোভ দেখিয়ে বিপথে নিয়ে যাওয়ার মত আশেপাশে অনেকেই ঘোরাঘুরি করছিল। তাই বিয়েটা তাড়াতাড়িই সেরে ফেলে নিমাই। নইলে অত ব্যস্ত হবার কারণ ছিল না।

'মায়ামৃগ' ফ্লপ করার পর ওরা আর তেমন চান্স পায়নি, ঝর্ণাও না, নিমাইও না। সাতমাসে ঝর্ণার এ্যাবরশন হয়ে যাওয়ার পর ওর শরীর একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। এ্যামেচার ক্লাবগুলি থেকে আগের মত ডাক আর আসত না, যারা ডাকত তারাও এত কম টাকা দিতে চাইত যে তা নিতে ওদের আত্মসম্মানে বাধে। তবু ওরা অভিনয় ছাড়ে নি, প্রাণপণে তাকেই আঁকড়ে রয়েছে। ঝর্ণার পক্ষে অন্য কোন জীবিকা নেওয়া সম্ভব নয়। ওর তেমন বিদ্যাবুদ্ধি নেই। আর নিমাইর

যদিবা ছিটেফোঁটা এক আধটু আছে তার চেয়ে বেশি আছে ছুষ্টা সরস্বতীর চাপ। অনেকদিন ধরে চাকরিবাকরি নেই নিমাইর। শিগগির যে কিছু জুটবে তেমন আশাও ছেড়ে দিয়েছে। নিমাই পাড়া ছেড়ে চলে আসবার পর নাট্যচক্র উঠে গেছে। টাকা পয়সা আর কে জোগাড় করবে। তা ছাড়া আরো একটা কারণ আছে। ঝর্ণার প্রণয়প্রার্থী সেই দলেও ছিল, নিমাই যে চট করে তাকে ঘরণী করে বসবে এবং তার ত্রিসীমানায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঘেঁষতে দেবে না এটা তারা আশা করে নি।

চায়ের কাপ হাতে ঝর্ণা এসে ঢুকল; আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'কলহটা তাহলে প্রেমজ বিবাহেও হয়? কি নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল তোমাদের?'

ঝর্ণা একটু লজ্জিত হয়ে চোখ নামাল। তারপর ফের আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি না জিজ্ঞেস করলেও কথাটা আমি বলতাম দাদা। আপনিই পরামর্শ দিন, কি আমাদের করা উচিত। শ্বশুর শাশুড়ী ভাসুর জা সবাই আমাদের ফিরিয়ে নিতে চান। কিন্তু উনি যাবেন না।'

আমি নিমাইর দিকে চেয়ে বললাম, 'বল কি এতখানি উদার হয়েছেন ওরা! নিতে যদি চান তবে যাচ্ছ না কেন?'

বলল, 'উদার হয়েছেন মানে আমাদের দুর্দশা দেখে সদয় হয়েছেন। আমার অসুখের খবর পেয়ে বাবা মা সেদিন এসেছিলেন। আর একদিন দাদা বউদি। না খেয়ে আছি কিনা স্বচক্ষে দেখে গেলেন, ওঁরা আমাদের নিয়ে যেতে চাইছেন, কিন্তু কি কি সর্তে তা একবার ওকে জিজ্ঞাসা করুন।

ঝর্ণার দিকে তাকাল নিমাই।

সে চুপ করে রইল দেখে নিমাই-ই ফের বলতে লাগল, 'ঝর্ণাকে অভিনয় টভিনয় একেবারে ছেড়ে দিতে হবে। ঘরের কাজ কর্ম

ছাড়া সে আর কিচ্ছু করতে পারবে না। ওঁদের বাড়ি থেকে ঝি চাকর পালিয়েছে। ঝর্ণা কম্বাইন্‌ড হ্যাণ্ডের কাজ করতে পারবে।

বললাম, 'ছিঃ, ওসব কেন বলছ। তোমার বউকে তাঁরা গৃহলক্ষ্মী করেই নেবেন।'

নিমাই বলল, 'নামটা অন্তত গৃহলক্ষ্মীর উপযুক্ত হয়েছে। ঝর্ণা নিজের নামটা পর্যন্ত বজায় রাখতে পারবে না। নানাজনের মুখে, পোষ্টারে আর কাগজে ছাপা হয়ে ওর নামটা পর্যন্ত অশুচি হয়ে গেছে। ওঁরা নাম বদলে রাখবেন কমলা। ঝর্ণা তাতেও রাজী। কিন্তু আমি কি ওকে এই জন্যে বিয়ে করেছিলাম কল্যাণদা? কত আশা করেছিলাম দুজনে মিলে নাট্যচক্রকে গড়ে তুলব, আমরা দুজনেই আর্টিষ্ট হব, বড় আর্টিষ্ট। কিন্তু ও এত অল্পেই হার মানল কল্যাণদা!'

ঝর্ণা বলল, 'কি রকম অবুঝ দেখুন দাদা। আগে বাঁচতে হবে না। ওঁকে বাঁচাবার যে এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। আমি কি আমার জন্যে ভাবি? তা ছাড়া ঘরের বউ বলে আমাকেই ওঁরা আটকে রাখতে পারবেন। ওঁকে তো আর পারবেন না।'

নিমাই আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'কিন্তু আমার চেয়ে ওর পার্টস যে বেশি ছিল তা ও বোঝে না কল্যাণ দা। একবার সেই খপ্পরে ধরা দিলে আর কি বেরোতে পারবে? ছেলে হবে মেয়ে হবে, আরো কত বাঁধনে জড়িয়ে পড়বে। শেষ বয়সে যখন মুক্তি মিলবে তখন কি ভিতরে আর কোন পদার্থ থাকবে কল্যাণদা?'

আমি ঝর্ণার পক্ষ নিয়ে নিমাইকে এ সুযোগ না হারাবার জন্যে পরামর্শ দিলাম। বললাম, 'তোমাদের আগে প্রাণে বাঁচা দরকার, সুস্থ হওয়া দরকার। তারপর অন্য ভাবনা।'

একটু পরে নোটখানা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে আমি বিদায় নিলাম। নিমাই কিছুতেই টাকা নেবে না। অভিমানের স্বরে বলল, 'আর দরকার নেই কল্যাণদা, আর ওতে দরকার নেই।'

অসুস্থ দেহে নিষেধ সত্ত্বেও রাস্তার মোড় পর্য্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিতে এল নিমাই। চলে আসার আগের মুহূর্তে হঠাৎ আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, 'আপনার কাছে মিথ্যে বড়াই করেছিলাম কল্যাণদা, ভুল করেছিলাম। ছোট সাপ আর বড় সাপ এক নয়, ছোট নদী আর বড় নদী এক নয়। ব্যর্থতা আর সার্থকতা এক নয়। সিদ্ধি ছাড়া সংসারে আর কিছুরই দাম নেই কল্যাণদা।'

অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে সামনের দিকে এগুতে এগুতে ভাবলাম, এক যে নয়, দাম যে নেই তাতো প্রতি মুহূর্তেই টের পাচ্ছি!

দুই লেখক

মাসিক কাগজ বের করে যে দৈনিক আহার নিদ্রা বন্ধ করতে হবে এমন আশংকা করিনি। তা'হলে সম্পাদক হওয়ার আগে হয়তো একটু ইতস্ততঃ করতাম। বহিরঙ্গের কথা না হয় বাদই দিলাম। কাগজ মুদ্রাযন্ত্র এবং সরকারী অনুমতি সংগ্রহের কৃচ্ছ্রতার কথা থাক্, আভ্যন্তরীণ কথাই বলি।

মাসিক পত্রখানি নতুন হলেও প্রচলিত দেশাচার এবং পাঠকদের অভ্যাসের কথা স্মরণ করে প্রবীণ এবং নাতিনবীন লেখকদের কাছেই তাঁহাদের রচনার প্রার্থী হয়েছিলাম। কেননা নতুন জ্বর আর নতুন চাকরের মত একেবারে আনকোরা নতুন লেখককেও পাঠকেরা সহসা বিশ্বাস করতে চান না এবং সম্পাদক অথবা স্বত্বাধিকারীর স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। কিন্তু অর্থ ব্যয় করলেও যে সব সময় ভালো লেখকের কাছ থেকে ভালো লেখা পাওয়া যায় তা নয়, বরং এমনই প্রায় বেশী দেখা যায় যে নতুন কাগজে লিখতে হবে শুনলেই পুরোন লেখকরা হঠাৎ নতুন ধরণে লিখতে সুরু করে দেন। তাও না হয় এক রকম সয়ে নেওয়া গেল কিন্তু এমন একদল আছেন যাঁদের কাছ থেকে লেখা আদায় করাই দায়। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু। নিত্য নতুন ওজুহাত, নিত্য নতুন কৈফিয়ৎ।

এমনি জনকয়েক লেখকের কাছে ঘুরে ঘুরে পায়ের শিরা উপশিরা যখন দৃশ্যমান হবার জো হল, মনে মনে স্থির করলাম চালু লেখকেরা

আপাতত স্বস্তিতে থাকুন আমি এই অবসরে চেষ্টা করে দেখি অচালুদের চালু করতে পারি কি না। মনে মনে স্থির করলাম এবার থেকে আবিষ্কার করব পুরোণ লেখকদের, সৃষ্টি করব নতুন লেখক কুলকে। যাঁরা এক সময় সম্ভূত হয়ে ছিলেন যাঁদের মধ্যে নতুন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, আমরা পত্রিকার প্রাঙ্গণে তাঁদের সবাইকে ডেকে আনব।

প্রথমেই মনে পড়ল সুখেন্দুর কথা। ছেলেটি এবার সন্ত বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে। ফল এখনো বের হয়নি। আমাদের অফিসে প্রায়ই আসে। কাছাকাছিই কোথাও থাকে। গোপনে গোপনে সে যে কোথাও লেখে সেটা তার চাল চলনে হাব-ভাবে বহুদিন ধরেই প্রকাশ পাচ্ছে, কেবল ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হতেই যা বাকি।

একদিন তাকে ডেকে খুব পিঠ চপেড়ে দিলাম, বললাম, আপনার গল্প নিশ্চয়ই ছাপব। কিন্তু সব চেয়ে সেরা গল্পটি চাই। তবে একটু ভালো করে দেখে শুনে দেবেন। সময় রইল এক সপ্তাহ।

উৎসাহের আধিক্যে সুখেন্দু বলল, অত সময়ের দরকার হবে না।

বললাম, সময় বরং একটু বেশী থাক, তাড়াতাড়ির দরকার নেই।

এর পর মনে পড়ল মুরারিবাবুকে। আমাদের কিশোর বয়সে এর গল্প নিয়ে কত যে আলোচনা সমালোচনা শুনেছি তার আর শেষ নেই। মাসিক পত্রে মুরারিবাবুর একেকটি গল্প বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাদা আর তাঁর বন্ধুমহলে হৈ চৈ পড়ে যেত। ডাইনে বাঁয়ে দুটি ধারায় সমান বেগে বয়ে চলত নিন্দা প্রশংসার স্রোত। তখন মুরারিবাবুর গল্প ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না। দাদা আর তাঁর বন্ধুদের সমালোচনা বুঝতাম আরও কম। কিন্তু দুরূহ আর দুর্বোধ্য সেই বাচনভঙ্গির মধ্যে এক অনাস্বাদিত রহস্য যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার আভাস আমার কাছে একবারে গোপন থাকত না।

তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে তাঁর কথার জট যত খুলতে শিখলাম, তাঁর চিন্তার জটে তত জড়িয়ে পড়তে ভালো লাগল।

কিন্তু আশ্চর্য্য, তার লেখার রস মনের মধ্যে সম্পূর্ণ জারিয়ে উঠতে না উঠতে হঠাৎ একদিন তিনি গল্প লেখা বন্ধ করে দিলেন। অবশ্য একেবারে বন্ধ হওয়ার আগে আরো কয়েকটি লেখা তার পড়েছিলাম। কিন্তু সে যেন তাঁর লেখা নয়। আর কেউ তাঁর নামে লিখেছে। এত অক্ষম এত দুর্ব্বল রচনা ছিল সেগুলি। দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলাম। কিন্তু আরও বিস্মিত আর আহত হলাম যখন তিনি লেখা একেবারেই ছেড়ে দিলেন। বছরের পর বছর কাটতে লাগল, কাগজের পর কাগজ বেরোতে লাগল, কিন্তু মুরারিবাবুর নাম আর কোথাও দেখলাম না।

আধুনিক লেখকদের অপ্রিয় ব্যবহারে আমার সেই প্রিয় পুরোণ লেখকটির কথা আজ নতুন করে মনে পড়ল। তিনি যে জীবিত আছেন এখবর তাঁর কয়েকজন বন্ধু বান্ধবের মারফৎ পেয়েছিলাম, তাঁদের কাছ থেকে সংগ্রহ করলাম ঠিকানা। সেই বন্ধুদের একজন আমার সঙ্গে যাবেন এমন কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেটা হয়ে উঠল না। তবু নিরুদ্যম না হয়ে একাই যাত্রা করলাম।

কলকাতা থেকে মাইল বার দূরে মিল অঞ্চলের ছোট একটি সহরে তাঁর আধুনিক ঠিকানা। সেখানকারই একটি মিল অফিসে তিনি কাজ করেন। আলাপ আলোচনার জন্য ছুটির দিনই প্রশস্ত বলে অফিসের দিনগুলি বাদ দিয়ে একটি রবিবারেই দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলাম। এটুকু বুঝেছিলাম যে এতদিনের স্তব্ধতা ভাঙতে হোলে কেবল দু'একখানা চিঠিতে চলবে না; এই নির্বাপিত আগ্নেয়গিরিকে আবার অগ্নিময় করে তুলতে হলে আরো অনেক অধ্যবসায় এবং কৃচ্ছ সাধনের প্রয়োজন হবে। যাওয়ার আগে একটা চিঠিও অবশ্য তাঁকে দিয়েছিলাম, লিখেছিলাম তাঁরই একজন প্রাক্তন গুণমুগ্ধ পাঠক আমি, তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ এবং আলাপ

পরিচয় করতে চাই। প্রত্যুত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের জন্য তিনি খুব উৎসুক এবং কৌতূহলী রইলেন।

মনে মনে খুব আশান্বিত হলাম। ঔৎসুক্য আর কৌতূহল যাঁর এখনো রয়েছে তিনি কিছুতেই নিঃশেষ হননি। শিল্পীদের সম্বন্ধে কখনো নিরাশ হতে নেই। বহির্লোকে অন্তর্লোকে সর্বত্র তাঁদের অনুভূতির জাল ছড়ানো। জীবন আর জগৎ সম্বন্ধে কখন যে কোন বিচিত্র রহস্য সেই জালে ধরা পড়বে তা আমরা কেউ জানি না। এই সম্ভাবনাকে স্বীকার করাই ভালো। অধীর না হয়ে অসহিষ্ণু না হয়ে এইটুক আশা পোষণ করে যেতে পারলেই ভালো যে আজ যাঁর দানে মন ভরল না কাল তার দান হয়তো সমস্ত কার্পণ্য ছাপিয়ে উপচে পড়তেও পারে।

ষ্টেশনে বার তের বছরের একটি সুদর্শন ছেলে অপেক্ষা করছিল। গাড়ি থেকে নেমে একটু এদিক ওদিক তাকাতেই সে আমার দিকে এগিয়ে এল। বলল, আপনার নাম অতীনবাবু তো ?

বললাম, হ্যাঁ, কি করে তুমি বুঝলে বলতো ?

ছেলেটি মৃদু হেসে বলল, ঠিক কি আর বুঝেছি মশাই ? ঠুকে দিলাম আন্দাজে ঠক্ করে লেগে গেল। চলুন চলুন, আপনি আমাদের বাড়িতেই খাবেন।

তবু একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বাবার নাম কি ? ছেলেটি বিরক্ত হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, আঃ আপনার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? আমার বাবার নামই মুরারি মুখার্জী। নিন, এবার হোল তো। এখন চলে আসুন চটপট।

ছেলেটি এগুতে লাগল। বিশ্বাস করতে যেন একটু কষ্টই হোল। ছেলেটির সপ্রতিভতা উপভোগ করলেও মুরারিবাবুর ছেলের কাছ থেকে আরও কিছু মার্জিত শিষ্টাচার আশা করেছিলাম। বার তের বছর বয়স তো আমাদের দেশে নিতান্ত কম নয়।

সহরটি ছোট হ'লেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে দেখলাম। পিচ ঢালা বড় একটি রাস্তার খানিকটা হেঁটে বাঁক নিলাম বাঁয়ে। তারপর এসে পড়লাম অপেক্ষাকৃত নির্জন এক পল্লীতে। ছোট ছোট একতলা কোঠাবাড়ি, উঠানের উপর কারো কারো আম কাঁঠালের গাছ। মাঝে মাঝে নারকেল সুপারির সার চোখে পড়ল। ছোট একটা একতলা বাড়ির সামনে এসে ছেলেটি থামল, বলল, এই আমাদের বাড়ি। কিন্তু বাবা বোধ হয় এখন ঘরে নেই। পুকুরে চান করতে নেমেছেন। ওই দেখুন।

ছেলেটির আঙ্গুল লক্ষ্য ক'রে দেখলাম খানিকটা দূরেই মাঝারি আকারের একটি পুকুর, তাতে এক পাল ছেলেমেয়ে ঝাপাঝাপি দাপাদাপি করছে। আর একজন প্রৌঢ় বয়স্ক ভদ্রলোক কখনো অনুনয় বিনয়ে কখনো বা শাসনে তিরস্কারে জল থেকে তাদের তুলতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠছেন না।

ছেলেটি সোৎসাহে বলল, চলুন না দেখবেন মজা। বাবাকে ওরা কেমন ক্ষেপিয়ে তুলেছে একেবারে। উনি ভেবেছেন আমার সঙ্গে আড়াআড়ি ক'রে আমার ছোট ভাই বোনদের সঙ্গে মিতালি করবেন। সেটি আর হতে দিচ্ছি না। দিয়েছি ওদের কানে মন্তর দিয়ে। এখন বুঝুন ঠেলা। চলুন না।

বললাম, না, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি। তুমি গিয়ে খবর দাও। আর তোমার বাবা যখন পেরেই উঠছেন না, তুমি নিজেই গিয়ে তুলে আনো ওদের। তবে তো বোঝা যাবে বাহাদুরিটা কার বেশি। কলকাতায় গিয়ে গল্পও করব সকলের কছে।

ছেলেটি যেতে না যেতেই দেখতে পেলাম মুরারিবাবু ছোট মেয়েটির গালে ঠাস ক'রে এক চড় বসিয়ে দিলেন। গামছা দিয়ে মাথার চুল মুছে দিলেন আর একজনের। ছেলেটি ইতিমধ্যে সেখানে গিয়ে পৌঁছল এবং বোধ হয় আমার আসার খবর জানাল। মুরারিবাবু দুই

ডুবে স্নান সেরে মাথা মুছতে মুছতে তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন এদিকে। আমাকে দোরের সামনে দেখে অত্যন্ত অপ্রস্তুতের মত দু' হাত কপালে ছুঁইয়ে বললেন, নমস্কার। শেষ পর্যন্ত আপনি এলেনই। আমি কিন্তু আশাই করতে পারিনি।

তাঁর মুখের ভাব দেখে মনে হোল আশা নয়, আমি আসব বলে তিনি আশংকা করেননি।

বললাম, গাড়ির গোলমালে একটু অসময় হয়ে পড়েছে। আপনাকে বোধ হয় বিব্রত করলাম।

তিনি বললেন, কিছু না কিছু না, এমন কোন ব্রত আমার আর নেই যার থেকে আপনি আমাকে বিব্রত করতে পারেন।

মুরারিবাবু একটু হাসলেন। বললেন, আসুন।

পিছনে পিছনে ঢুকলাম তাঁর বাড়িটির মধ্যে। বাইরের দিকের একটি ঘরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গোটাকয়েক চেয়ার। তার একটা একটু এগিয়ে আনলেন। আমাকে বসবার জন্য অনুরোধ করে তিনি ভিতরে ভিজে কাপড় ছাড়তে গেলেন।

বসে বসে দেখলাম দাওয়ায় টাঙানো একটা লোহার খাঁচার মধ্যে সবুজ রঙের একটি টিয়া ছোট্ট একটু বাটির ভিতর থেকে ঠুকরে ঠুকরে দানা খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে অস্পষ্ট শব্দে কি ডেকে ডেকে উঠছে। বোলটা হয়তো গৃহস্বামীর কাছে অর্থময় কিন্তু তা আমার কাছে কোন ব্যঞ্জনা বয়ে আনল না। বারান্দার একধারে দেখলাম বাঁশ আর বেতের কয়েকটি অসম্পূর্ণ শিল্প। ঝাঁপি, সুটকেশ, ছোট ছেলেদের বসবার জন্য একখানি চেয়ারের কাঠামো। কোনটিই শেষ হয়নি।

উঠানের পুব দিকে খানিকটা খোলা জায়গা। তার একদিকে সব্জীর বাগান, আর একদিকে দেশী বিদেশী কয়েকটি ফুলের চারা অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে। বুঝতে পারলাম গৃহস্বামীর খেয়ালে এক সময়ে তাদের উদ্ভব হলেও শেষ পর্যন্ত তারা তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখতে পারেনি।

একটু বাদেই কাপড় বদলে মুরারিবাবু এলেন এই ঘরে। গায়ে সাদা একটা হাত কাটা ফতুয়া।

বললেন, খুব দেরী হয়ে গেল।

বললাম, না না আপনি বরং আরও কিছু দেরী করে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আসুন।

মুরারিবাবু বললেন, ভয়ে ভয়ে বলছি আমিও সেই প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। বড় সহরের বাস অনেকদিন তুলে দিয়েছি। সুতরাং নিখুঁত নাগরিকতা আমার কাছ থেকে নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন না। গ্রাম্যিক বলে গাল দিতে চান দিন, কিন্তু অতিথিকে এখানে বসিয়ে রেখে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বহুবার তাঁকে বললাম যে আমি স্নানাহার শেষ করে এসেছি, কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়লেন না।

অগত্যা যেতেই হোল তাঁর সঙ্গে। মাঝখানে বড় একটি ঘরের মেঝেয় হাতে বোনা ফুল লতা তোলা দু'খানা আসন পাশাপাশি পাতা রয়েছে। সযত্নে মাজা বড় বড় দুটি জলভরা কাঁসার গ্লাস চক্‌চক্ করছে আসনের ডান দিকে, দেখে মন তৃপ্তিতে ভ'রে উঠল। তারপর থালায় করে ভাত নিয়ে এলেন মুরারিবাবুর স্ত্রী। খাটো একটু ঘোমটার আড়ালে মুখখানা চকিতে চোখে পড়ল। সে মুখ সুন্দর কি অসুন্দর তাতে যৌবনশ্রী এখনো আছে কি নেই এ সব প্রশ্ন আমার মনে উঠল না। এমন শান্ত, নম্র একখানি মুখে এত বেদনা এত নৈরাশ্যের ছাপ যে কি ক'রে পড়ল সেই কথাই ক্ষুব্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবতে লাগলাম। কথাও শুনলাম তাঁর। মাঝে মাঝে মৃদু অভিযোগ শুনতে হোল যে আমি কিছুই খাচ্ছিনে। কোন কোন তরকারি আরও একটু বেশি ক'রে নিতে একাধিকবার অনুরোধও করলেন, বিস্মিত না হয়ে পারলাম না, মুখে যাঁর এত দুঃখ, এত হতাশার চিহ্ন তাঁর কণ্ঠে এমন মাধুর্য কি ক'রে এল!

অন্য ঘর থেকে ছেলেমেয়েদের কোলাহল ভেসে এলো। বুঝতে পারলাম সেখানে তাদের খেতে দেওয়া হয়েছে।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে ফের গিয়ে মুরারিবাবুর বাইরের ঘরটিতে বসলাম। চেয়ারগুলি একদিকে সরিয়ে রেখে পাটির ওপর বালিশ পেতে ইতিমধ্যেই সেখানে বিশ্রামের আয়োজন ক'রে রেখেছেন তাঁর স্ত্রী। পানের বাটায় সযত্নে রাখা ক'টি পান, লবঙ্গ, এলাচের দানা। একটি লবঙ্গ তুলে নিলাম তা থেকে।

মুরারিবাবুর মুখোমুখি বসে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলাম, তারপর বললাম, আমার কাগজের জন্য আপনাকে আবার নতুন করে লেখা সুরু করতে হবে। এই দাবী নিয়েই এসেছি।

মুরারিবাবু মৃদু হাসলেন। আপনার দাবীর জোরকে অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের কলমের জোরকে স্বীকার করতে পারলে ভালো হোত। কিন্তু তা' আর হবার জো নেই অতীনবাবু। লেখা আমি অনেক কাল ছেড়ে দিয়েছি। ফের তা সুরু করা মানে সেই শেষ করারই জের টেনে চলা। তাতে লাভ নেই।

ব্যথিত কণ্ঠে বললাম, কেন ছাড়লেন ?

মুরারিবাবু বললেন, না হ'লে দু'দিন পরে লেখাই আমাকে ছাড়ত। সেই ছেড়ে যাওয়ার লক্ষণ ইতিমধ্যেই আমার চোখে পড়তে সুরু করেছিল। আপনার কাছে কথাটা হেঁয়ালির মত মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি। জিনিষটা আমার কাছেও তখন কম হেঁয়ালি ছিল না। মানুষের বয়স বাড়ে, অভিজ্ঞতা বাড়ে, বুদ্ধির সঙ্গে চুল দাড়িতে পাক ধরে কিন্তু একদিন অবাক হয়ে দেখলাম সেই সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সৃষ্টি ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে সমান তালে উঠে যায় না। তা কখনো থামে, কখনো নামে। এমনো হয় যে ফের আর ওঠেই না। বয়স থাকলেও লেখা অদ্ভুতভাবে কেটে যেতে থাকে। আমি হাতের অক্ষরের কথা বলছি না বাইরের গঠন বিন্যাসের কথা বলছি না, বলছি

তার ভিতরকার প্রাণবত্তার কথা, তার লাবণ্যের অভাবের কথা. এ অভাব যে কি অভাব তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। এই দৈন্য রসিকের চোখ এড়ায় না, লেখকের চোখে ব্যর্থতার জ্বালা আর নৈরাশ্যের অশ্রু নিয়ে আসে।

একদিন রাত্রে সেই জ্বালা, সেই অশ্রু নিজের চোখে অনুভব করলাম। জীবনে এমন বহুবারও এসেছে গেছে কিন্তু সেদিনের রাত যেন চিরন্তন হয়ে রইল। সদ্যতম রচনাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম, কিন্তু তবু সেই পঙ্গু রচনার অশরীরী প্রতিবিম্ব বিকৃত-মুখে আমাকে ব্যঙ্গ করতে লাগল।

স্ত্রী এসে বললেন, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ? সাংসার, ছেলে-পুলে, এ সব দায়িত্বের কথা তোমার কি একটুও মনে পড়ছে না ?

নিজের কথাটা বোধ হয় অত্যন্ত অভিমানেই আর তিনি উল্লেখ করলেন না।

ভেবে দেখলাম সত্যিই তো। প্রায় পাগলই তো হ'তে বসেছি। এমন পাগলামির কি অধিকার আছে আমার ? কি অর্থ হয় এর ? Cross word puzzle এর মত দিনরাত কেবল এই কথা খোঁজা আর কথা সাজানোর ছেলেখেলার কি মানে হয় ? ছোট মেয়েরা যেমন ঘরের মধ্যে আলাদা এক খেলার ঘর পাতে এও যেন তেমনি। বাইরের বিরাট বিশ্বজগতে আমার তৃপ্তি নেই, আমি চাই আর এক নকল গড় গড়তে। বাইরের হাওয়া আমার গায়ে লাগে না, বাইরের রোদ আমি চেয়ে দেখি না, মানুষগুলি ছায়ার মত আমার অশরীরী ideaর মত ঘোরাফেরা করে। তারা জীবন্ত হবে কেবল আমার কথায়, কেবল আমার অক্ষরের গাঁথুনিতে। মনে হোল জীবনের পূর্ণ উপভোগ এমন ক'রে হয় না। তার পদ্ধতি আলাদা। মনে হোল অদ্ভুত এক নেশার খেয়ালে নিজেকে এতদিন আচ্ছন্ন রেখেছিলাম, বঞ্চিত করেছিলাম নিজেকে। অলক্ষ্যে আসল জীবন একটু একটু করে সরে গেছে দূরে, সরে গেছে সংসার। স্ত্রীর কাছে আমি

আর অপরিহার্য নয়, আমাকে বাদ দিয়েই চলেছে তার দিনযাত্রা। তার অন্তর্লোক থেকে কখন যে আমি সরে এসেছি সে নিজেও জানে না, আমিও নয়। দেখলাম ছেলেমেয়েরা আমাকে চেনে না। আমার অস্তিত্ব তাদের প্রয়োজনের জন্য আছে, আনন্দের জন্য নেই। তাদের শিক্ষা দীক্ষায় দিন যাপনে কোন ছাপ নেই আমার, কোন প্রভাব মাত্র নেই। আগাছার মত, আবর্জনার মত উদ্দেশ্যহীন যদৃচ্ছভাবে যেন কেবল প্রকৃতির খেয়ালেই তারা বেড়ে উঠেছে।

চমকে উঠলাম। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম সব পাণ্ডুলিপি, জীবনের ইতিহাস নয়, জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়, জীবনের ব্যাখ্যা টীকা টিপ্পনী কিছু নয়, আমি চাই আসল জীবনকে। দু' হাতে আঁকড়ে ধরে একান্ত আপনার করে আমি পেতে চাই আমার স্ত্রীকে পুত্র কন্যাকে। সমস্ত সংসারকে জড়িয়ে ধরতে চাই আমি।

কিন্তু আমার এই অদ্ভুত আকর্ষণে, আমার নিবিড় বাহুবন্ধনের মধ্যে তাদের বোধ হয় দম বন্ধ হয়ে আসার জো হোল, প্রতি মুহূর্তে ছটফট করতে লাগল তারা। আমার অমনোযোগ আমার ঔদাসীন্য তাদের সহ্য হয়েছিল কিন্তু আমার প্রেম তারা সহ্য করতে পারল না। আমার অতি নৈকট্যের উত্তাপ তাদের দগ্ধ করতে লাগল, সুতরাং আবার সরে এলাম। পুষলাম পাখি, পুতলাম ফুল ফলের চারা। শিখলাম বাঁশের কাজ, বেতের কাজ, কাগজ কেটে লতা ফুল বানানো। অনেক ভালো মশাই, অনেক ভালো এ সব মিথ্যা। একবার শিখলে আর ভুল হয় না। চোখ বুজেও আপনি হাত চালিয়ে যেতে পারেন। এক আধটু ভুল হলেও ক্ষতি নেই। কাজ পছন্দমত না হ'লে হয়তো সামান্য একটু মন খুঁৎ খুঁৎ করবে কিন্তু এমন অসন্তুষ্টি কিছুতেই আপনার আসবে না যার জ্বালায় আপনি আত্মহত্যা করতে যেতে পারেন! এ সব বিত্যা অনেক নিরাপদ, অনেক শান্তির, অনেক স্বস্তির। সাধ্বী স্ত্রীর মত এ সব চিরকাল আপনার আয়ত্বে থাকবে, আপনার

অনুগমন করবে, স্বভাবচঞ্চলা বরাঙ্গনার মত ক্ষণেক কণ্ঠলগ্ন থেকে পরক্ষণেই আপনার কণ্ঠরোধ ক'রে ধরবে না। দূর থেকে নমস্কার করি আপনাদের সাহিত্যলক্ষ্মীকে। তাঁর শ্রীচরণের বাহন শ্রীমান পেচক হয়ে থাকবার আর সাধ নেই জীবনে।

মুরারিবাবু থামলেন। বুঝলাম এরপর আর কোন কথা বলা নিস্ফল। দু' একটা অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হোল। সে আলোচনা যে নেহাৎই বাইরের, দু' জনেই সেটা অনুভব করলাম। একটু বাদে মুরারিবাবু বললেন, কিছু মনে করবেন না, ভারি ক্লান্তিবোধ করছি, একটু না গড়িয়ে নিলে বোধ হয় পারব না। বয়সের ভারটা ক্রমেই ঘাড়ে চাপছে। আপনি কি শোবেন? বিছানা করে দেবে আপনার?

বললাম, না না, তার কোন দরকার নেই। আপনি বরং একটু বিশ্রাম করুন, আমি ততক্ষণ এ মাসের কাগজপত্রগুলি একটু উল্টে পাল্টে দেখি।

মুরারিবাবু আমার কথায় একটু মৃদু হাসলেন। বললেন, আপনি যে সম্পাদক তা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করতে করতে মুরারিবাবু এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাসিক সাপ্তাহিকগুলি সবই দেখা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তবু মুরারিবাবুর ঘুম ভাঙল না। ভাবলাম এবার উঠে পড়ি। ওঁর ঘুম ভাঙানোর চেয়ে ওঁকে একটা স্লিপ লিখে রেখে গেলেই চলবে। তাই করলাম। ছেলেপুলেদের কাউকেই দেখছি না। সবাই বোধ হয় এই অবসরে পাড়ার সঙ্গী সাথীদের দলে গিয়ে মিশেছে। ডাকাডাকি করে তাদের সাড়া পাওয়া যাবে না। মুরারিবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার কথাটা মনে হোল। কিন্তু তাঁরও কোন সাড়া পাচ্ছি না। হয়তো কাজকর্ম সেরে শ্রান্তিতে তিনিও ঘুমিয়ে পড়েছেন। খানিকটা ইতস্তত করে সদর দরজার দিকেই

এগুতে লাগলাম। হঠাৎ পিছন থেকে অত্যন্ত অস্ফুট একটি শব্দ ভেসে এলো, শুনুন।

পিছনে ফিরেও তাঁকে চিনতে কষ্ট হোল না। সে কণ্ঠ একবার শুনলে ভোলা যায় না।

ফিরে তাকিয়ে লজ্জিতভাবে বললাম, কথায় কথায় মুরারিবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। ভেবেছিলাম আপনিও ঘুমিয়েছেন। ছেলেদের কাউকেই দেখছি না। সদর দরজা খোলা দেখে ভাবছিলাম এভাবে যাওয়াটা সঙ্গত হবে কি না। আপনি এলেন ভালোই হল। সুযোগ পেলাম বিদায় নেওয়ার।

তিনি এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, আমিও একটা সুযোগের আশাতেই এসেছি।

বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম।

মুহূর্তের জন্য লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠল। বলি বলি করেও কি যেন একটা কথা বলতে পারছেন না বলে মনে হোল। তারপর হঠাৎ সমস্ত দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে আঁচলের তলা থেকে একটা কাগজের পুলিন্দা বার ক'রে তিনি আমার হাতে দিলেন, মুখ নিচু ক'রে বললেন, আমার স্বামীর লেখা। তিনি সবটুকু সত্য কথা আপনাকে বলেননি, এখনো রোজই প্রায় লিখতে বসেন। এগুলি আমি তাঁকে ছিঁড়তে দেইনি।

তাঁর দুটি আনত চোখে যেন নববধূর লজ্জা, নববধূর গোপন আনন্দ প্রত্যক্ষ করলাম।

বললাম, আমি এর জন্যই এসেছিলাম। আমাকে শূন্য হাতে যে ফিরে যেতে হোল না সে কেবল আপনারই দয়ায়।

কতকগুলি সাংসারিক এবং বৈষয়িক কাজে ব্যস্ত থাকায় পুলিন্দাটা সেদিন খুলতে পারলাম না। ভাবলাম অফিসে গিয়েই নিজের নিভৃত কক্ষে এর রসোপভোগ করব। একটু সকাল সকালই যাচ্ছি অফিসে, মাঝপথে দেখা হয়ে গেল সুখেন্দুর সঙ্গে।

সুখেন্দু আমাকে দেখে আনন্দে অধীর হয়ে উঠল, বলল, কালকে একটি নতুন গল্পই লিখে ফেললাম অতীনবাবু।

বললাম, বেশতো সেটিই দেবেন।

সুখেন্দু বলল, হ্যাঁ, তাই ইচ্ছা আছে। মনে হচ্ছে আমার অন্য সমস্ত লেখাকে এটি ছাড়িয়ে গেছে। পড়ে আপনি নিশ্চয়ই খুসি হবেন।

লেখকের খুসি তার চোখে মুখে আগেই দেখতে পাচ্ছিলাম।

বললাম, ভালোই তো, লেখাটি এবার পেঁৗছে দেবেন আমাদের অফিসে।

আনন্দে প্রায় গলে গেল সুখেন্দু। বলল, সে হবে খ'ন, কিন্তু এই সামনেই আমাদের বাড়ি। একটু চা খেয়ে যেতে হবে আপনাকে দয়া করে।

বললাম, চা খাওয়ার কি এই সময়?

সুখেন্দু হেসে বললে, চা খাওয়ার কি সময় অসময় আছে? আসুন না দয়া করে। সত্যি ভারি খুসি হব আপনি এলে।

বুঝতে পারলাম আমার যাওয়ার ওপর তার খুসি হওয়া নির্ভর করছে না। সে খুব খুসি হয়েছে বলেই আমাকে যেতে বলছে। হাতে যদিও কাজ আছে এবং আমার মন পড়ে আছে মুরারিবাবুর লেখাগুলির মধ্যে তবু সামান্য এক কাপ চায়ের জন্য ছেলেটিকে ক্ষুণ্ণ করতে বাধল।

বললাম, চলুন।

বেশ অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। বাবা কাকাদের মধ্যে কেউ হাইকোর্টের উকিল, কেউ বা এ অঞ্চলের নাম করা ডাক্তার। দাদারা সব সরকারী অফিসের বড় বড় চাকুরে।

তেতলার একটি দক্ষিণ খোলা ঘরের নীল পর্দা তুলে সুখেন্দু আমাকে নিয়ে ঢুকল। সানন্দে সগর্বে বলল, এই আমার বাড়ি।

দেয়াল ভরা দেশ-বিদেশী সাহিত্যিকদের ফটো, গুটি দুয়েক কাঁচের আলমারীতে সাজানো বিভিন্ন যুগের নাম করা ইংরেজী বাংলা কাব্য সাহিত্য।

দক্ষিণের একটি জানালার ধারে ধবধবে সাদা টেবিলক্লথে ঢাকা মাঝারি সাইজের একটি লিখবার টেবিল। টেবিল ঢাকনির কোণে কোণে একটু একটু সূঁচের কাজ। আলঙ্কারিক অক্ষরে এক জায়গায় লেখা আছে মীরা।

এক কিনারে খানিকটা ফাঁকে ফাঁকে চমৎকার দুটি ফুলদানি রাখবার গুণে মনে হচ্ছে ফুলগুলি যেন এইমাত্র গাছ থেকে ছিঁড়ে আনা হলো। টেবিলের উপর একটি প্যাড এখনো খোলা রয়েছে। কলমদানিতে একটি দামী ফাউনটেন পেন। নিজের বসবার বড় চেয়ারটায় সাড়ম্বরে আমাকে নিয়ে বসাল সুখেন্দু। তারপর বিনীত ভঙ্গীতে পাশে দাঁড়িয়ে আমার মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

বললাম, সত্যিই বেশ চমৎকার সাজিয়েছেন ঘরখানি। সাহিত্য চর্চার পক্ষে রীতিমত লোভনীয় জায়গা।

সুখেন্দু সানন্দে মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বলল, একটু বসুন চায়ের ব্যবস্থাটা করে আসি।

ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুখেন্দু। প্যাডে লেখা পাতাটার ওপর নিজের অজান্তেই চোখ গিয়ে পড়ল। একটি মেয়েকে লেখা একখানি চিঠির অংশ। কৌতুক এবং কৌতূহল বোধ করতে করতে কয়েক লাইন পড়েই ফেললাম:

লেখার আনন্দ তোমাকে ঠিক ছোঁয়ার মত, তোমাকে চুমু খাওয়ার মত। যদি বলি তার চেয়েও যেন বেশি, তাহলে রাগ করো না মীরা! তোমাকে নিয়েই তো লিখি, তবু লিখতে লিখতে তোমার কথা মনে থাকে না। ভারি অদ্ভুত নয়? কাল সারারাত এই লেখা নিয়ে কেটেছে। এক লাইন লিখি আর গান গাইতে ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করে সমস্ত সহরটি একবার করে টহল দিয়ে আসি। ভারি অদ্ভুত নয়? এই লেখাটিই পাঠাচ্ছি সেই 'উদয়ন' পত্রিকায়। সামনের মাসেই প্রকাশিত হবে। সম্পাদকের আশ্বাস পেয়েছি।

উহু কোন কপি পাঠাতে পারব না। তোমাকে নিজে পয়সা দিয়ে কিনে নিতে হবে আমার লেখা।

এরই মধ্যে সুখেন্দু এসে পড়ল। আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি একটা বই চাপা দিল প্যাডের পাতার ওপর, এবং লজ্জিত অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললাম, কই আপনার লেখাটা কই ?

কুণ্ঠিত বিনয়ে সুখেন্দু বলল, আমি নিজে গিয়ে অফিসে পৌঁছে দিয়ে আসব।

হেসে বললাম, একই কথা। তার চেয়ে আমাকে দিয়েই দিন না। এলামই যখন—।

দেরাজের ভেতর থেকে বেশ পুরু একটি গল্প বের করল সুখেন্দু! দামী কাগজে মুক্তোর মত হস্তাক্ষর। সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে লেখাটি নিয়ে পকেটে ভরলাম।

চা সিগারেটে খানিকক্ষণ কাটল। তারপর বললাম, এবার ওঠা যাক।

পিছনে পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত সুখেন্দু আমাকে এগিয়ে দিয়ে এল। প্রসন্ন তৃপ্তিতে তার চোখ মুখ যেন টলটল করছে।

অফিসে এসেই খুলে বসলাম মুরারিবাবুর পুলিন্দা। দেখলাম একটি নয় দু' তিনটি অসম্পূর্ণ গল্প তাতে একসঙ্গে বাঁধা রয়েছে। কোনটির বা একাধিক রকমের সূচনা। কিন্তু কিছুই যেন লেখকের পছন্দ হয়নি। যত লিখেছেন তার চেয়ে কেটেছেন অনেক বেশি। অসংখ্য কাটাকুটিতে রচনাগুলির অধিকাংশই দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন এলোমেলো পাতাগুলি এক পাশে সরিয়ে রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। এই সেই মুরারিবাবুর লেখা

তারপর বের করলাম সুখেন্দুর পুরু খাতাটি। গল্পটি সম্পূর্ণ, কোন কাটাকুটি নেই, অস্পষ্টতা নেই, শোভন সুন্দর হস্তাক্ষর। কিন্তু পড়তে গিয়ে প্রতি ছত্রে হোঁচট খেতে হোল। কোন চরিত্র রূপ

পায়নি, বিন্দুমাত্র গাঁথুনি নেই গল্পাংশের, উচ্ছ্বাসে আর উচ্ছলতায় ভাষা সমস্ত সংযম হারিয়ে ফেলেছে। তবু সমস্ত ত্রুটি সমস্ত অসম্পূর্ণতা ছাপিয়ে উঠেছে সুখেন্দুর সৃষ্টির উদ্বেল আনন্দ, তা যেন কোন বাঁধ মানবে না, বাধা মানবে না। কিন্তু এ রচনাটিকেও এক পাশে সরিয়ে রাখতে হোল। সুখেন্দুর গল্পও ছাপা চলবে না।

পাত্রী

সকালবেলায় বাজার সেরে এসে দেখি বন্ধু ভবেশ দত্ত আমার বসবার ঘরে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। তার পাঠ্য বিষয়টির দিকে একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে হেসে বললাম, 'কি হে, এখনো পাত্রী চাই নাকি? তোমার স্ত্রীকে বলে আসতে হবে তো কথাটা।'

ভবেশের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। সহরের একটি নামকরা ব্যাঙ্কের কলেজ স্ট্রীট ব্রাঞ্চের এ্যাকাউনট্যাণ্ট, তিনটি ছেলে-মেয়ে হয়েছে। বেশ ভালো।

আমার কথায় ভবেশও একটু হাসল। কাগজটা এক পাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'তা বলে দেখতে পার।'

বাজারের থলিটা ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে দু'কাপ চায়ের কথা বলে বন্ধুর সামনে চেয়ার টেনে বসলাম। বললাম, 'কথাটা এড়িয়ে যেয়ো না। সত্যিই কি মেয়ে-টেয়ে চাই নাকি? ছেলে আছে? আমার একটি শ্যালিকা—'

ভবেশ বাধা দিয়ে বলল, 'একটি কেন, দশটি শালী আইবুড়ো থাকলেও ঘটকালির মধ্যে যেয়ো না ভাই। ওতে বড় ঝক্কি।'

ছেলে-মেয়ে নিয়ে স্ত্রী বাপের বাড়ি বেড়াতে গেছে। ঝি এসে চা দিয়ে চলে গেল। কাপে চুমুক দিয়ে হেসে বন্ধুকে বললাম, 'ব্যাপার কি, বল তো। এত চটে আছ কি জন্যে?'

ভবেশও হাসল, 'এই তিন মাস ধরে ইংরেজী-বাংলা কাগজগুলিতে মেয়ে চাই বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া, সকালবেলায় অন্য সব খবর পড়বার আগে কারা পাত্র চায় তাদের খোঁজ নেওয়া, মাস চারেক ধরে এই ছিল আমার কাজ। সে কাজ মিটেছে। কিন্তু অভ্যাসটা এখনও যায়নি। আজও কাগজ খুললে পাত্র-পাত্রীর কলমে গিয়েই প্রথমে চোখ পড়ে।'

বললাম, 'কার জন্যে বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলে? মেয়ে খুঁজছিলে কার জন্যে?'

ভবেশ বলল, 'আবার কার জন্যে? শ্যালক, বড় কুটুম্ব।'

হেসে বললাম, 'আজকাল ঘটকের পদটা তাহলে সব জামাইকেই নিতে হয়। আমার শালীটিও বি, এ, পাশ করে বনমালী বিদ্যাপীঠে মাষ্টারী করছে। দেখতে-শুনতে মন্দ নয়। গাইতে পারে। শ্বশুর মশাই তো আমাকে অস্থির করে তুলেছেন।'

ভবেশ বলল, 'ওঁরা অস্থির করবার জন্যেই জন্মান। তুমি নিজের বাড়িতে স্থির হয়ে বসে থেকো। খবরদার কাছেও ঘেঁষো না।'

ভবেশের কথার ভঙ্গিতে হেসে বললাম, 'ব্যাপারখানা কি?'

চায়ের কাপ শেষ ক'রে ভবেশ সিগারেট ধরাল। খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ব্যাপার অনেক। বলতে গেলে গোড়া থেকেই বলতে হয়।'

বললাম, 'তাই বলো না। রবিবার, তাড়া তো কিছু নেই।'

'তা অবশ্য নেই।' বলে ভবেশ সিগারেটে আরো গোটা দুই টান দিয়ে তার সেই শ্যালকের কাহিনী স্বরু করল ঃ

'বিজনের সম্বন্ধে আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বছর চারেক আগে কেমিস্ট্রিতে একটা হাই সেকেণ্ড ক্লাস নিয়ে রিসার্চের নাম ক'রে সেই যে সায়ান্স কলেজের গহ্বরে গিয়ে ঢুকেছে আর বেরোবার নাম নেই। জানো বোধ হয় আমার শ্বশুর একজন এল, এম, এফ ডাক্তার। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন

ওকে ডাক্তারী পড়াতে। ছোটখাট ডিসপেন্‌সারি তো একটু আছেই। বিজন এম, বি পাশ করলে সেটাকে আরো বড় করবেন এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। বিজন কিন্তু ও-পথেই গেল না। আমি আর আমার স্ত্রী ওকে ডেকে এনে কত বুঝিয়েছি, তা সত্ত্বেও না। এম, এস, সি পাশ করবার পর আমরা সকলেই ভাবলাম এবার একটা চাকরি-বাকরি করবে। কলেজের প্রফেসরিই হোক কি কোন লেবরেটরিতেই হোক যে কোন ভদ্ররকম মাইনেয় ঢুকে পড়বে, তাই আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু তেমন সুবিধা-সুযোগ কিছু ঘটল না। বাড়ির সবাই ওর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। শ্বশুর মশাইর অনেক ছেলে মেয়ে। তাছাড়া ভাইপো-ভাইঝিরাও এসে আশ্রয় নিয়েছে। ব্যয়ের তুলনায় আয় নগণ্য। পুরনো জামাই বলে আর পর্দার ব্যবধান ছিল না। কথা খুলে বলতেন। ওঁদের সংসারের অভাব-অনটনের কথা শ্বশুর-শাশুড়ী দু'জনেই খুলে বলতেন। আর বিজনকে নিয়ে আমার সামনেই তাঁদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হোত। এসব অশান্তির ভয়ে পটলডাঙ্গার বাসায় আমি ইদানীং যাওয়াই বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম।

কিন্তু সেদিন অফিস থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে এক চমকপ্রদ খবর পেলাম। চা আর জলখাবার দিতে দিতে সুখবরটি শোনাবার আগে অমিয়া একটু ভূমিকা ক'রে নিল, 'বিজুর কথা শুনেছ ?'

বললাম, 'না, চাকরি বাকরি পেয়েছে নাকি ?

অমিয়া বলল, 'পাবে না ? তোমরা কি ভেবেছ চিরকালই ওর এক রকম ভাবে কাটবে ? বিজু তো আমেরিকায় যাচ্ছে।'

'বল কি ? কেন ?'

অমিয়া বলল, 'চিকাগো ইউনিভার্সিটির নাম শুনেছ ? সেখান থেকে বিজুর ডাক এসেছে। তাঁরা ওর থিসিস পছন্দ করেছেন। বিজু সেখানে কাজ করবে, রিসার্চ করবে। মাসে মাসে সাড়ে তিনশ' ডলার মাইনে পাবে ; টাকার হিসাবে বল তো কত টাকা হয় ?'

বললাম, 'দাঁড়াও হিসেব করে দেখতে হবে।'

অমিয়া বলল, 'বাবা হিসেব করে বলে গেলেন সতের শো'র ওপর, তোমার জন্যে অনেকক্ষণ বসেছিলেন। বেশি দেরী করতে পারলেন না, আরো অনেক জায়গায় যেতে হবে।'

বুঝতে পারলাম কলকাতা সহরের আত্মীয়-বন্ধু সকলেই আজ রাত্রের মধ্যে খবরটা পেয়ে যাবেন।

পরদিন তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে পটলডাঙ্গায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখি, অমিয়া গিয়ে তার আগেই হাজির হয়েছে। ছেলে-বুড়ো সকলের মুখে হাসি। বাড়ি শুদ্ধু লোকের চেহারাই যেন পাল্‌টে গেছে! সেই পুরনো নড়বড়ে ভাড়াটে বাড়িটা নবযৌবন পেয়ে মাথা খাড়া ক'রে উঠেছে। চিকাগোতে কবে সেই বিবেকানন্দ গিয়েছিলেন আর আজ আমাদের বিজনানন্দ যাচ্ছে। আনন্দের বান ডেকেছে শ্বশুরবাড়িতে।

দেয়ালে দেয়ালে আমেরিকার ছোট-বড় মানচিত্র টাঙানো। ছোট শালা-শালীরা চিকাগো সহরটিকে দাগিয়ে দাগিয়ে ফুটো করে দিয়েছে।

শাশুড়ী বললেন, 'এসো বাবা, তোমার তো দেখাই পাই না।'

শ্বশুর মশাই বললেন, 'বোসো, অনেক পরামর্শ আছে।

ছোট শালা-শালীরা কলরব করে ঘিরে ধরল, 'আজ কিন্তু থেকে যেতে হবে জামাইবাবু।'

মাছে মাংসে খাওয়া-দাওয়ার একটু বিশেষ আয়োজন হোলো। পুরো রাতটা না থাকতে পারলেও অনেক রাত অবধি থেকে আমরা নানা বিষয়ের আলোচনা করলাম। আমি, অমিয়া আর ওঁরা দু'জন।

বিজন তার ছোট চিলেকোঠায় ঢুকতে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে বললাম, 'আরে এসো এসো বৈজ্ঞানিক, শুনি দেখি সব।'

বিজন স্মিতমুখে সামনে এসে দাঁড়াল। অনেক দিন পরে যেন ওকে দেখলাম। ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যুবক। বেশ লম্বা-টম্বা হয়েছে। এত দিন বড় বেশি গম্ভীর আর বিষণ্ণ বলে মনে হোত।

আজ দেখলাম সেই মুখে প্রসন্ন আনন্দের ছাপ পড়েছে। স্নোই বল, আর পাউডারই বল, সাফল্যের চেয়ে বড় টয়লেট আর নেই।

বললাম, 'তোমার থিসিসের বিষয়টা যেন কি!'

বিজু হেসে বলল, 'জামাই বাবু, এত দিনই যখন তা ভাবেননি, আরো ক'টা দিন পরেই না হয় জানবেন।

বিজু জানে বিজ্ঞান সম্বন্ধে তার দিদি আর জামাইবাবুর জ্ঞান এবং ঔৎসুক্য প্রায় একই রকম।

বিজুর বাবা বলে দিলেন বিষয়টা। মানুষের দেহে এ্যাটমিক এনার্জির প্রয়োগ সম্বন্ধে ওর গবেষণা চলছে। রোগ উপশমের নতুন ওষুধ কিছু বার করবার ইচ্ছা। ভাবলাম মনের রোগটা সারাচ্ছে কে, রোগের গোড়া তো সেইখানে।

বিজু ওর ঘরে চলে গেলে আমাদের আলোচনা ফের আরম্ভ হোলো। আমেরিকায় যেতে ওর মাস চারেক এখনো দেরি আছে। এর মধ্যে বিয়েটা সেরে দিতে পারলেই ভালো হয়। এখন অবশ্য ছ'বছরের চুক্তিতেই যাচ্ছে। কিন্তু পরে ভালো চাকরি-বাকরি পেয়ে গেলে ফিরতে আরো দেরি হবে।

বললাম, 'বিজু কি এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করবে?'

বিজুর মা বললেন, 'ভালো মেয়ে পেলেই করবে। ওর মত আছে। আমি ওর বন্ধুদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছি।'

ভালো মেয়ের ষ্ট্যাণ্ডার্ড নিয়ে এবার আলোচনা উঠল। রূপের দিক থেকে মেয়ের গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর হওয়া অবশ্য দরকার। কারণ, বিজুর গায়ের রঙ কালো। ছ'জনেই কালো হলে ছেলেপুলে ভালো হবে না। পাত্রীর নাক চোখ, দেহের গড়ন সম্বন্ধে শ্বশুর শাশুড়ী আর তাঁর কন্যাটি মিলে যে আভাস দিলেন কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই তার স্বপ্ন দেখেছেন। এর পর বিদ্যার কথা উঠল, আজকাল ছেলেরা চায় স্ত্রী অক্ষরে অক্ষরে সহধর্মিণী সমধর্মিণী হোক। সেদিক থেকে মেয়েটির এম-এস-সি

হলেই ভালো হয়, অন্তত পক্ষে বি-এস-সি। অমিয়া আর একটি গুণের কথা তুলল, গান। গানটা অবশ্যই জানা থাকা দরকার। গান অবশ্য সহরের সব মেয়েই আজকাল জানে। কিন্তু সে রকম জানা নয়। একটু বিশেষ পারদর্শিতা থাকাই দরকার। গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে বৈজ্ঞানিকের হয়ত সাধ যেতে পারে তার লেবরেটারিতেও গুন্‌গুনিয়ে ভ্রমর আসুক!

রূপ-গুণের পর প্রশ্ন উঠল আভিজাত্য আর বংশ-মর্যাদার। শ্বশুরমশাই কুলীন কায়স্থ—বোস, বাকি ঘোষ, গুহ, মিত্র এই তিন বংশ থেকেই পাত্রী নির্বাচন করতে পারলে ভালো হয়। শ্বশুর মশাই বললেন, 'কৌলীন্যটা একেবারে ফালতু বলে মনে কোরো না। ওর মধ্যে যদি কিছু নাই থাকবে—'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই আছে।'

আলোচনায় ঠিক হোলো কুলীন অভিজাত শিক্ষিত সংস্কৃতিবান ঘরের মেয়ে চাই। আর মেয়ের বাবার পক্ষে ধনী হওয়াই অপরিহার্য, কারণ অন্তত হাজার পাঁচেক টাকা নগদ আর সেই অনুযায়ী গহনা যৌতুক এ বিয়েয় তাঁকে দিতে হবে। যাঁর দেওয়ার সাধ্য আছে তিনিই যেন এ সম্বন্ধে অগ্রসর হন। শ্বশুরমশাই চান না ধার দেনা ক'রে কেউ তাঁর সঙ্গে কুটুম্বিতা করুন। আর বিয়ের পর বৈবাহিক মুখ ভার ক'রে থাকুন, কি নতুন বউ বিষন্ন মুখে ঘুরে বেড়াক।

জানাশোনা চেনা পরিচিতদের মধ্যে এমন রূপ-গুণ-বংশ-বিত্ত-সম্পন্না পাত্রী আমরা খুঁজে পেলাম না। সপ্তাহখানেক ধরে আমি আর শ্বশুরমশাই দু'জনেই স্বজন-বন্ধুদের মধ্যে সন্ধান চালালাম। খোঁজ না পেয়ে আমিই একদিন বললাম, 'খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখলে হয়। ঘটকের জায়গা আজকাল তো কাগজই নিয়েছে।'

পরামর্শটা শ্বশুরমশাইর পছন্দ হোলো। তিনি বললেন, 'ঠিক বলেছ। এত দিন মিছামিছি সময় নষ্ট হোলো। তুমি বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও।'

একখানা নয়, সহরের দু'খানা ইংরেজী, আর দু'খানা বাংলা প্রথম শ্রেণীর কাগজে আমরা পাত্রী চাই বলে বিজ্ঞাপন দিলাম। বিজ্ঞাপনের ভাব আর ভাষা আমাদের চারজনের বৈঠকে ঠিক হোলো। বিজুর দিদি তার ভাইকে দিয়েও বিজ্ঞপ্তিটুকু অনুমোদন করিয়ে আনল।

ফল কি হোলো বুঝতেই পারছ। কাগজের অফিসগুলি থেকে মেয়ের ফটো সমেত তাড়ায় তাড়ায় সব চিঠি আসতে লাগল। আমার বাসায় বিয়ের অফিস বসে গেল। অফিসের প্রধান কাজ হোলো সেই সব চিঠি খোলা, চিঠি পড়া, ফটো দেখে রূপ যাচাই করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করা। আচ্ছা, বাংলা দেশের মেয়ের বাপগুলির কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই? নাকি ইংরাজী বাংলা কোন ভাষাই তাঁরা বোঝেন না? না হলে বিজ্ঞাপন মাফিক চেহারা নয়, বিত্ত নয়, বংশ নয়, তবু পয়সা খরচ ক'রে চিঠি আর ফটো তাঁরা পাঠাচ্ছেন, বিজুকে জামাই হিসাবে পাওয়ার জন্য আগ্রহ জানাচ্ছেন।

বেশীর ভাগ চিঠিরই আমরা কোন জবাব দিলাম না। যে দু'চার জন পত্রলেখকের চিঠি আমরা বিবেচনার যোগ্য মনে করলাম তাঁদের সঙ্গে অবশ্য আলাপ আলোচনা চলতে লাগল। আমি আর আমার শ্বশুরমশাই গিয়ে কয়েকটি মেয়ে দেখেও এলাম। অবস্থায়, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে খানিকটা খানিকটা মিল হলেও ফটোর সঙ্গে আসল চেহারার একেবারে আকাশ-পাতাল তফাৎ হতে লাগল। নানা দিক বিবেচনা ক'রে যে মেয়েটির সম্বন্ধে একটু বা অনুকূল হয়, সবান্ধব বিজু গিয়ে তাকে একেবারে অপছন্দ ক'রে আসে। এত দিন চোখ-মুখ বুজে বিজু লেবরেটরিতে পড়ে থাকলে কি হবে, দেখলাম এ ব্যাপারে ওর সৌন্দর্য-বিচার বড় কড়া। ও কেবল রাসায়নিকই নয়, রূপরসিকও।

দেখে-শুনে আমি একদিন অমিয়াকে বললাম, 'তোমার ভাইকে বলো আমেরিকা থেকেই একজন মেম-টেম বিয়ে করে নিয়ে আসুক, ওর যোগ্য পাত্রী এদেশে মিলবে না।'

অমিয়া আমাকে ধমক দিয়ে উঠল, 'তোমার ইচ্ছাটা বুঝি তাই ?'

আমি সবিনয়ে বললাম, 'তুমি অত রাগ করছ কেন ? খুব কাছে থেকে মেমের মুখ দেখা নিজের ক্ষমতায় তো কুলোলো না, বিজুর দৌলতে যদি হয়।'

এ কথার জবাবে অমিয়া মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

এর পর একটি ভালো সম্বন্ধ নিয়ে এল আমাদের ট্যাক্সি-ড্রাইভার অভয় দে। আমাদের মোটরকার নেই, কিন্তু এই মেয়ে দেখে বেড়ান উপলক্ষে একটি ড্রাইভার আমরা প্রায় বেঁধেই নিয়েছিলাম। মীর্জাপুর আর হ্যারিসন রোডের মোড়ে অভয়ের পুরোন ষ্টুডিবেকারখানা তুমিও দেখে থাকবে। অভয়কেও লক্ষ্য করার কথা। মাথায় টাক। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেখে অবশ্য একটু বেশিই মনে হয়। পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে অভয়ের ট্যাক্সি পেলে আমরা আর কারো গাড়ি নিতাম না। গাড়ি-খানা বড় আর ড্রাইভারটিও ভারি ভদ্র ; গরীব বলে সহজেই চেনা যায়, নিজের অবস্থাকে লুকোবার চেষ্টা অভয় কোন দিন করে না, হয়ত পারবে না বলেই। সংসারের অনেক ঝড়-ঝাপটা যে অভয়কে সইতে হয়েছে তা ওর চেহারা দেখেই বোঝা যায়। চিন্তায় উদ্বেগে কপালের ত্রিবলী স্পষ্ট আর গভীর, দুটি গাল ভাঙা। বেশ বোঝা যায়, যে পরিমাণ খাদ্য ওর বিপুল দেহের জন্যে দরকার তা জোগাবার সাধ্য ওর নেই। জানো বোধ হয়, পারতপক্ষে পয়সা খরচ ক'রে আমি ট্যাক্সিতে চড়ি না। শ্বশুরমশাইও প্রায় তাই। কিন্তু ইদানীং তাঁর চাল-চলন একটু বদলে গিয়েছিল। এখন থেকেই যেন ডলারের ছোঁয়াচ তাঁর গায়ে লেগেছে। শুধু তাঁর কেন, তাঁদের বাড়িশুদ্ধু সকলেই। যে বাড়ির ছেলে আমেরিকায় যায় তাঁদের রকম-সকম ধরণ ধারণ একটু আলাদা না হলে চলে না। ভালো পার্টির বাড়িতে গাড়িতে করে না গেলে তাদের ধারণা খারাপ হবে, এই ভেবেই শ্বশুর মশাই ট্যাক্সিতে ক'রে যেতেন। অভয়ের ওপর পক্ষপাতের আরো একটু

কারণ ছিল, ওর পয় ভালো। অভয়ের গাড়িতে উঠে শ্বশুরমশাই কয়েক বার ভালো ফল পেয়েছেন।

মেয়ে দেখে আর মেয়ের বাপের অবস্থা দেখে আমাদের পছন্দ হচ্ছে না শুনে অভয় একটি ভালো সম্বন্ধের কথা বলল। মেয়েটি ইংরেজীতে এম-এ, দেখতে সুন্দরী। মেয়ের বাবা হাইকোর্টের এ্যাড-ভোকেট। বাড়ি আছে ভবানীপুরে। এক ভাই বিলাতফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার।

মেয়ের এক মামাই যোগাযোগ করল। শ্বশুর মশাইর শরীরটা ভালো ছিল না। তিনি বললেন, 'তোমরাই আগে দেখে এসো।'

আমি আর বিজুই গেলাম প্রথমে দেখতে। বড়লোকের সাজানো বাড়ি, সাজানো ড্রয়িংরুম। আদর-আপ্যায়ন ভদ্রতা। জলখাবারের বিপুল আয়োজন। মেয়েটিকে দেখেও আমাদের ভারি পছন্দ হোলো। আমরা এত দিন যা খুঁজছিলাম ঠিক তাই। নামটিও সুন্দর, পারমিতা মিত্র। আলাপ করলাম, গান শুনলাম। ভারি মিষ্টি গলা। ক্লাসি-ক্যাল আর রবীন্দ্র সঙ্গীত দুইয়েরই চর্চা আছে। মেয়ের বাবা মক্কেলের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। বেশি সময় দিতে পারলেন না। একবার দেখা ক'রেই তাঁর ঘরে চলে গেলেন। মেয়ের মামাই আমাদের সঙ্গে বসে কিছুক্ষণ আলাপ করলেন।

আমরা তাঁকে পটলডাঙ্গায় আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে খানিক বাদে বিদায় নিলাম। আমরা যে খুব তাড়াতাড়িই শুভ কাজটা সেরে ফেলতে চাই সে কথাও জানিয়ে এলাম। গাড়িতে আসতে আসতে বিজুকে বললাম, 'এ বিয়ে হলে বউকে ছেড়ে আমেরিকায় যেতে কি তোমার মন সরবে?'

বিজু বলল, 'ছেড়েই যে যেতে হবে তার কি মানে আছে?'

দেখলাম বিজুর শুধু চোখই ফোটেনি, মুখও ফুটেছে।

বাসায় গিয়ে স্ত্রীর কাছে, শাশুড়ীর কাছে পারমিতার রূপ-গুণের গল্প করলাম। কিন্তু পাঁচ দিন গেল, সাত দিন গেল, ও-পক্ষ থেকে কেউ আর দেখাও করতে এলেন না, খোঁজ-খবরও নিলেন না।

ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন লাগতে লাগল। আমরা চিঠি দিলাম। জবাব এল, 'এখন আমাদের পক্ষে সম্বন্ধ করা সম্ভব নয়, দুঃখিত।'

শ্বশুরমশাই অভয়কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কি দে মশাই? তোমার আনা সম্বন্ধ এমন হোলো কেন?'

অভয় বলল, 'আজ্ঞে আমার কোন দোষ নেই ডাক্তার বাবু। আমি আপনাদের মান-সম্মানের কথা কিছু বলতে বাকি রাখিনি। তবু যে কেন ওঁরা—'

আরো কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা গেল। ড্রাইভারে ড্রাইভারে আলাপ। এ্যাডভোকেটের ড্রাইভারের কাছে অভয় খুব ফলাও ক'রে আমাদের অবস্থার কথা বলেছিল। আমার শ্বশুরমশাই বিলাতফেরৎ ডাক্তার, বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, ছেলে স্থায়ী চাকরি পেয়ে আমেরিকায় যাচ্ছে বলে গল্প করেছিল অভয়। কিন্তু আমাদের ভাড়া করা গাড়ি দেখে এবং আমাদের কথাবার্তা শুনে মামাবাবুর মনে কেমন সন্দেহ হয়। আমার মনে পড়ল শ্বশুরমশাই যে ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন তাও আমি কথায় কথায় বলে ফেলেছিলাম। যাই হোক, মামাবাবু গোপনে গোপনে খোঁজখবর নিয়ে দেখলেন তিনি যা শুনেছিলেন, আমরা তা নই। আমাদের বাড়ি নেই, গাড়ি নেই, বিষয়-সম্পত্তি নেই, ব্যাঙ্কব্যালান্স নেই, কেবল চিকাগোযাত্রী একটি বিদ্বান ছেলে আছে। এটা তিনি যথেষ্ট মনে করেননি। তাই শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেছেন। যেটুকু অগ্রসর হয়েছিলেন তার জন্যেই তাঁকে দিদি আর ভগিনীপতির কাছে বকুনি খেতে হয়েছে।

শুনে আমি, শ্বশুরমশাই আর আমার সম্বন্ধী তিন জনেই খুব গম্ভীর হয়ে গেলাম।

একটু বাদে শ্বশুরমশাই ফেটে পড়লেন, 'কেন তুমি ওসব কথা বলতে গেলে? কেন তুমি এমন ক'রে আমাদের অপমান করালে?'

অভয় মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বলল, 'আজ্ঞে ডাক্তার বাবু আমি তো—'

শ্বশুরমশাই ভেংচি কেটে উঠলেন, 'আমি তো আমি তো। যাও, আমার সামনে থেকে সরে যাও!'

বিজন আস্তে আস্তে বলল, 'অভয়বাবুর ওপর রাগ করছেন কেন বাবা, ওঁর কি দোষ?'

শ্বশুরমশাই বললেন, 'ওর দোষ না তো কার দোষ, যত সব'

ষ্টেথোস্কোপ গলায় দিয়ে শ্বশুরমশাই রোগী দেখতে বেরিয়ে গেলেন।

বিজু গম্ভীর মুখে ফের তার লেবরেটারিতে ঢুকল।

এর পর আরো কয়েকটা সম্বন্ধ এল। পাইকপাড়ায় বাজারে একটি মেয়ের খোঁজ পেলাম, বি, এস, সি, পাশ। বাপ ইনসিওরেন্স অফিসের অর্গানাইজার। ভাইরাও সব চাকরি-বাকরি করে। কেউ সরকারী কেউ বেসরকারী অফিসে। মেয়ের বাবা ভদ্রলোক বেশ হিসাবী লোক আছেন। পাইকপাড়ায় ছোটখাট একটু বাড়িই ক'রে ফেলেছেন এর মধ্যে। দেখে-টেখে আমাদের পছন্দ হোলো। ভাবলাম এঁদের সঙ্গে বনিবনাও হবে। তাঁরা এসে দেখে শুনে আলাপ ক'রে গেলেন। বিজু কিন্তু কিছুতেই মেয়ে দেখতে গেল না। বলল, 'আপনারা দেখলেই হবে।' দু'দফায় আমরা চারজনই দেখে এলাম। আমাদের সকলেরই পছন্দ হোলো। মেয়েটি সুশ্রী, বেশ চালাক-চতুর দেনা-পাওনা নিয়ে কথাবার্তাও প্রায় এক রকম ঠিক হয়ে এল। আমরা কিছু নামলাম, ওঁরা কিছু উঠলেন। মেয়ে ছেলে দেখতে চায়। বিজু বলল, 'আমার এখন সময় নেই।'

মেয়ের ভাইরা বলল, 'আচ্ছা', একটা ফটো আমাদের দিন, তাতেই হবে, আমরাই তো সব দেখে-শুনে আলাপ ক'রে গেলাম। জ্যোতি আবার কি দেখবে। একটা ফটো দিন। ওকে আমরা বুঝিয়ে বলব।'

দিলাম ফটো পাঠিয়ে। দু,দিন যায়, চার দিন যায়, আর কোন খবর নেই। এদিকে বিজুর আমেরিকা যাত্রার সময় এগিয়ে আসছে, আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম। শেষে শাশুড়ীর তাগিদে আমিই একদিন ফোন করলাম মেয়ের বড় ভাইকে, 'কি খবর প্রতুল বাবু?'

বড় ভাই কৈফিয়তের সুরে বললেন, 'আর বলবেন না, বাবা-মা আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটার মাথা খেয়েছেন। ওকে কিছুতেই রাজী করাতে পারলাম না।'

বললাম, 'কেন, ওর অমত কিসে?'

'আজ্ঞে সেটা বলবার মত কথা নয়। ছেলের চেহারা দেখে নাকি ওর পছন্দ হয়নি। ফটোটা আজই আমরা ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

আমি সশব্দে রিসিভার রেখে দিলাম।

শোন কথা! গুণবান পুরুষের আবার রূপ! আমাদের বিজু যে দেখতে ভালো নয়, ওর নাকটা যে চ্যাপটা, ঠোঁট মোটা, থুতনিটা একটু বেশি রকমের বড় এসব কথা আমাদের কোন দিন মনেই হয়নি। এ-ও কি একটা চোখে পড়ার মত বস্তু। পুরুষের গুণই তো তার রূপ, অমিয়া আর তার মার মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা হোলো। অমিয়া বলল, 'এ একটা ছুতো।'

শাশুড়ী বললেন, 'আসলে ও মেয়ের বিয়েতে ইচ্ছে নেই।'

অমিয়া বলল, 'নিশ্চয়ই কোন নটঘট আছে। আগে থেকেই আর কাউকে বিয়ে করবে বলে ঠিক ক'রে রেখেছে।'

বিজন গম্ভীর ভাবে বলল, 'ও সব আলোচনা থাক দিদি!'

অমিয়া বলল, 'তুই ভাবিস না বিজু! তোর জন্যে সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে যদি আমরা জোগাড় ক'রে না দিতে পারি—'

আমি পাদপূরণ ক'রে বললাম, 'তাহলে তোমার জামাইবাবুর নাম ফিরিয়ে নাম রেখ।'

বিজু হেসে বলল, কেবল নাম? দিদির যা রাগ, তাতে মানুষটি শুদ্ধু বদলে ছাড়বে।'

বিজুর রসিকতায় আমরা সবাই খুব খুসি হলাম। যাক, ব্যাপারটাকে ও তাহলে খুব সহজ ভাবেই নিয়েছে।

আমি আর অমিয়া আবার উঠে পড়ে লাগলাম, কাগজে কাগজে পাত্রী চাই বলে নিজের খরচে নতুন ক'রে বিজ্ঞাপন দিলাম। মুখে

মুখেও খোঁজ-খবর করতে লাগলাম। সুন্দরী অসুন্দরী বাংলা দেশের অনেক অনূঢ়া মেয়ের ফটোতে আমার অফিস আর বাড়ির দেরাজ ভরে উঠল। অফিসের সবাই ঠাট্টা করতে লাগল, 'ভবেশ বাবু আর ব্যাঙ্কে পড়ে আছেন কেন? একটা ঘটকালির অফিস খুলে তার চেয়ারম্যান হয়ে বসুন।'

বললাম, 'আরে ভাই, ব্যাঙ্কের চাকরি যায় যাক, শ্বশুরবাড়ির চাকরিটি গেলে এ বয়সে আর মেয়ে দেবে কে?'

শেষ পর্যন্ত আর একটি মেয়ের আমরা খোঁজ পেলাম। আমাদের ম্যানেজিং ডিরেকটরেরই দূরসম্পর্কের ভাইঝি, বি, এ, পাশ করে এ, জি, বেঙ্গলে চাকরী করছে। দেখতে সুন্দরী বলা চলে। রেডিওতে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রোগ্রাম পায়। দেখে শুনে আলাপ ক'রে আমার তো বেশ পছন্দই হোলো। শ্বশুর মশাইও দেখলেন। ভাবী বৈবাহিকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে খুসি হলেন। মেয়ের বাবা তেমন কিছু দিতে পারবেন না, তবে বিজুর আমেরিকা যাওয়ার খরচা বহন করতে রাজি হয়েছেন। আসলে সেইটাই আমাদের দরকার। শ্বশুরমশাই বললেন, বিয়ের জন্য বিশেষ কোন খরচপত্র করবেন না। অনর্থক অর্থ আর সময় নষ্ট, থোক টাকাটাই যাতে বিজুর হাতে ধরে দেওয়া যায়, সেই চেষ্টাই তিনি করবেন। আমরাও বললাম, 'সেই ভালো, আনন্দ-উৎসবের সময় পরে পাওয়া যাবে।'

সব ঠিকঠাক। এবার বিজুর ডাক পড়ল। বিয়ের দিনটা ঠিক করার আগে ওর মত নেওয়া দরকার। এত দিন আমরা ওর আর তেমন খোঁজখবর করিনি। ও লেবরেটারিতে কাজ করে করুক। এ সব তুচ্ছ সাধারণ বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে গবেষককে বিরক্ত ক'রে লাভ কি?

বিজুকে ডেকে শ্বশুরমশাই বললেন, 'কবে দিন ঠিক করব বল।'

বিজু বলল, 'কিসের দিন?'

শ্বশুরমশাই বললেন, 'কিসের আবার, বিয়ের।'

আমি আমাদের মনোনীত পাত্রীর রূপ-গুণের বর্ণনা দিলাম। বরপণ হিসাবে পারাণীর পূরো কড়িটাই যে মেয়ের বাবা গুণছেন সে কথাও বললাম।

বিজু গম্ভীর ভাবে বলল, 'না ক'রে দিন, আমি ওখানে বিয়ে করব না। আপনারা আর আমার জন্যে ওসব চেষ্টা করবেন না।' বলে বিজু উঠে গেল।

আমি অবাক। শ্বশুর মশাই ক্রুদ্ধ।

শাশুড়ী শুধু বললেন, 'এ তুই কি বলছিস বিজু!'

এবার অমিয়ার শরণ নিয়ে বললাম, 'যেমন ক'রে পার, তোমার ভাইকে রাজী করাও। না হলে আমার চাকরি নিয়ে টান পড়বে।'

অমিয়া বলল, 'তোমার কোন চিন্তা নেই। বিজুকে সব জিজ্ঞেস করে দেখছি। আমি ওর মত করাতে পারব।'

আমি খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। দুই ভাই-বোনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গভীর।

বাপের বাড়িতে অমিয়া দু'দিন কাটাল। বিজুর খোঁজে তার লেবরেটরিতে গেল। ওকে সঙ্গে নিয়ে আরো কোথায় কোথায় ঘুরল। তারপর বাসায় ফিরে এল গম্ভীর মুখে। বললাম, 'কি ব্যাপার?'

অমিয়া বলল, 'ব্যাপার সুবিধে নয়। ও মন স্থির করে ফেলেছে।'

বললাম, 'তার মানে বিয়ে করবে না?'

অমিয়া বলল, 'করবে। তবে তোমার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ভাইঝিকে নয়।'

'তবে কাকে?'

'অভয় দের মেয়েকে।'

'সে আবার কে?'

'ট্যাক্সি ড্রাইভার অভয় দে। চেন না তাকে?'

'তাকে তো চিনি। কিন্তু তার মেয়েকে—'

অমিয়া বলল, 'তাকে তোমার না চিনলেও চলবে। একজন চিনেছে, তার চোটেই অস্থির।'

অনুনয় বিনয়ের পর অমিয়ার মেজাজ ঠাণ্ডা হলে তার কাছ থেকে আস্তে আস্তে জেনে নিলাম ঘটনাটা। পারমিতারা যেদিন আমাদের প্রত্যাখ্যান করে তার অল্প কিছুদিন পর থেকেই অভয়ের মেয়ের সঙ্গে বিজুর আলাপ হয়। বন্ধুর সঙ্গে আর একটি মেয়ে দেখে অভয়ের গাড়িতেই বিজু ফিরে আসছিল, মাঝপথে বন্ধু কি একটা দরকারী কাজে নেমে গেল। বিজু সায়ান্স কলেজে যাবে। অভয় বলল, 'চলুন, আমিই আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসি। কতটুকু বা পথ।'

বিজু বলল, 'আচ্ছা।'

রাজাবাজারের কাছাকাছি এসে অভয় বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন বিজন বাবু, বাসায় ওষুধটা দিয়ে আসি।'

'কোথায় বাসা?'

'এই কাছেই। ষষ্ঠীতলা লেন।'

বিজু ভদ্রতা ক'রে জিজ্ঞাসা করল, 'অসুখ কার?'

'বেলার মার।'

'বেলা কে?' বৈজ্ঞানিকের স্বাভাবিক কৌতূহল।

অভয় বলল, 'আমার মেয়ে। ওর কথাই তো আপনাকে সেদিন বলছিলাম বিজন বাবু! একটা চাকরি বাকরি দিন জুটিয়ে। ড্রাইভারি ক'রে দিন তো আর চালাতে পারি নে। বয়সও হয়ে গেছে। স্বাস্থ্যেও কুলোয় না। রোজগার যা হয় তার অর্ধেকের বেশি গাড়ির মালিককে ধরে দিতে হয়। মেয়েটার যদি কোন রকম কিছু একটা জুটত।'

বিজন জিজ্ঞাসা করল, 'পড়াশুনো কোন পর্যন্ত করেছে!'

অভয় বলল, 'আজ্ঞে বেশি দূর আর পড়তে পারল কই। নিজের চেষ্টায় টিউশনি ক'রে প'ড়ে দু-দুবার ম্যাট্রিক দিয়েছিল। দু'বারই ফেল করল। একবার অঙ্কে আর একবার ইংরেজীতে।'

বিজন জিজ্ঞাসা করল, 'কি আর করবে টিউশনি ক'রে।'

'আট টাকা দশ টাকা যা পায় তাই লাভ। নিজের চেষ্টায় টাইপটা শিখে নিয়েছে। পরীক্ষা দিয়ে পাশও করেছে। কিন্তু চাকরি পাচ্ছে না।'

বিজু গম্ভীর ভাবে বলেছিল, 'চাকরি হওয়া তো শক্তই।'

খানিক বাদে এক বস্তির মধ্যে গাড়িখানা ঢুকিয়ে দিল অভয়। করোগেটের টিনের ছাউনি, মাটির দেওয়াল। ছোট ছোট সব বাড়ি। সামনে উঠানের মত খানিকটা ফাঁকা জায়গা। খোলা কলের কাছে নানা-বয়সী বউ-ঝি জল নেওয়ার জন্যে এসে জড় হয়েছে। কারো হাতে বালতি, কারো কাঁখে কলসী। কোত্থেকে বিকেলের একটু পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছে সেই কলসীতে।

অভয় তাদের ভিতর থেকেই এক জনকে ডেকে বলল, 'বেলা, এদিকে আয়। তোর মার ওষুধটা নিয়ে যা।'

জলের বালতিটা ঘরে রেখে এসে বেলা লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা নিচু ক'রে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। পরনে আটপৌরে আধময়লা মিলের শাড়ি। জায়গায় জায়গায় ভিজে গেছে। হয়ত সেই জন্যেই এত সংকোচ বেলার।

ওষুধের শিশিটা হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে অভয় বলল, 'তোর মাকে দিস, আর ইনি কে জানস, বিজন বাবু, বৈজ্ঞানিক, নিউটন-আইনষ্টাইনের নাম শুনেছিস তো? তাঁদের জাত, বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় যাচ্ছেন। এঁর জন্যেই মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা। এঁর উপযুক্ত মেয়ে পাওয়া কি সহজ?'

বিজু লজ্জিত হয়ে বলল, 'আপান থামুন তো অভয় বাবু!' তার পর প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্যেই বেলার সঙ্গেও একটু আলাপ করল বিজু, 'আপনার কথা এইমাত্র ওঁর কছে শুনছিলাম।'

বেলা বিজুর মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হেসে চোখ নামাল। তার পর মৃদু স্বরে বলল, 'আপনার কথা বাবার কাছে আমিও রোজ শুনি।'

বিজু বলল, 'সে ঠিক শোনবার মত কথা নয়। চলুন অভয় বাবু।'

বেলা এবার সোজাসুজি তাকাল, 'সে কি, একটু চা খেয়ে যাবেন না? এত কাছে এসে—ওই তো আমাদের ঘর।'

বিজু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না, না, আজ বড় তাড়া আছে।'

বেলার মুখে কিসের একটু ছায়া পড়ল! বলল, 'তাহলে থাক আপনার দেরি করিয়ে দেব না।'

গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিল অভয়, পথে আসতে আসতে বিজুর মনে হোলো মেয়েটি অন্য কিছু ভেবে দুঃখ পেল না তো? কথাটা একবার বললও অভয়কে, 'আপনার মেয়ে কিছু মনে করলেন না তো?'

অভয় হেসে বলল, 'না, না, মনে আবার কি করবে। ওর মনে করা না করায় কি এসে-যায়।'

বিজু বলল, 'সে কথা বলছি না। আচ্ছা, আমি ওঁর চাকরির জন্য চেষ্টা ক'রে দেখব।'

অভয় খুসি হয়ে বলল, 'করবেন? তাহলে তো খুব ভালোই হয়। বড় অসুবিধেয় পড়ে গেছি বিজন বাবু! একটা ভালো টিউশনি সেদিন বেলাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। তারা পনের টাকা করে দিত।'

'কেন, তারা কি নিয়মিত মাইনে-টাইনে দিত না?'

'বরং উল্টো। মাইনে তাঁরা নিয়মিতই দিতেন। অবস্থা বেশ ভালো। বৈঠকখানার বাজারে বালতি-কড়াইয়ের ব্যবসা আছে।'

বিজু জিজ্ঞাসা করল, 'তবে সে টুইশনি ছেড়ে দিলেন কেন?'

অভয় একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'মেয়েদের অনেক বিপদ জানেন তো? বেলা দুটি বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েকে পড়াত। একটি টু আর একটি থ্রির ছাত্রী। ছেলেপুলে হবে বলে তাদের

মা গেল হাসপাতালে। বাপ সেই সুযোগ নিয়ে—সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড বিজন বাবু! বলবার কথা নয়।'

বিজু বলল, 'থাক। আপনাকে আর বলতে হবে না।'

অভয় বলল, 'বেলাও সহজ মেয়ে নয়। খুব কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে এসেছে নিরঞ্জন বাবুকে। মানহানির মামলা করবে বলে শাসিয়ে এসেছে। বাসায় ফিরে উকিলের কাছে যেতে চেয়েছিল। আমি আর আমার স্ত্রী দু'জনে মিলে মেয়েকে ঠাণ্ডা করেছি। কি দরকার আর ঝামেলা বাড়িয়ে। মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে ব্যাপার! আপনি যদি ওর জন্যে একটু চেষ্টা ক'রে দেখেন—'

বিজু বলল, 'নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।'

তার পর লেবরেটরিতে গিয়ে সুস্থ মনে আর কাজ করতে পারেনি বিজু। একটি শ্যামবর্ণ সাধারণ মেয়ের মুখ বার বার বৈজ্ঞানিকের ধ্যানভঙ্গ করেছিল।

দিন কয়েক বাদে বিজু সত্যিই একটি চাকরির খোঁজ নিয়ে এল। তারই পুরোন বন্ধুরা মিলে এক ফার্ম খুলেছে বরানগরে, ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন, কেমিষ্ট এণ্ড ড্রাগিষ্টস্। খোঁজ পাওয়া গেল তাদের একটি টাইপিষ্টের দরকার। বিজু জোর ক'রে বলল তার একজন ক্যাণ্ডিডেট আছে। তাকে নিতেই হবে। অফিস-ম্যানেজার সুধাংশু ভরসা দিল, 'বেশ তো, তাকে নিয়ে এসো।'

ঠিক হলো বেলা একটার পর বিজু বেলাকে নিয়ে যাবে তার বন্ধুদের ওখানে।

অভয় বলল, ট্রাম-বাসে আর পয়সা নষ্ট ক'রে কি হবে। চলুন আমিই আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।'

পিছনের সিটে দু'জনে পাশাপাশি বসল। অভয় গাড়ি চালাতে লাগল। তার সামনের দিকে চোখ। বেলার চোখও রাস্তার দিকে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি কোথায় রইল তা আর বলে দরকার নেই। তা যে অণুবীক্ষণ নয়, মনোবীক্ষণ, সে কথা বলা বাহুল্য।

সেদিন বেলার পরনে ছিল পুরান একখানা চাঁপা রঙের শাড়ি আর ব্লাউস। নিজেই ধুয়ে শুকিয়ে ইস্ত্রি ক'রে পরে এসেছে। বাইরে বেরবার জন্য ওই একখানা কাপড়ই সম্বল ; হাতে দু'গাছি ক'রে প্লাষ্টিকের চুড়ি। মাত্র এতটুকু আবরণ-আভরণে বৈজ্ঞানিকের মনে যে কিসের রঙ লাগল তা কে বলবে। আমরা তো বৈজ্ঞানিকও নই, কবিও নই। রঙের না জানি রাসায়নিক বিশ্লেষণ, না জানি রসের ব্যঞ্জনা।

বেলার চাকরি কিন্তু ফ্রেণ্ডস ইউনিয়নে হোলো না। সুধাংশু সোম বেলার সঙ্গে আলাপ ক'রে, পড়াশুনোর কথা জিজ্ঞাসা ক'রে বিজুকে আড়ালে ডেকে দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলল, 'পারলাম না ভাই। এই পোষ্টের জন্য একটি মেয়েকে অবশ্য আমরা নেব। কিন্তু যেখানে অন্তত দশটি গ্রাজুয়েট ক্যাণ্ডিডেট আছে সেখানে একটি আণ্ডার ম্যাট্রিককে কি ক'রে নিই ? আমি ভেবেছিলাম তুমি যখন রিকমেণ্ড করছ—'

বিজু বলল, 'টাইপটা ও কিন্তু ভালোই জানে। আমি নিজে দেখেছি।'

সুধাংশু মুচকি হেসে বলল, 'তা জানি। তোমার বন্ধু হিসাবে সেইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ম্যানেজার হিসাবে তো তা নয়।'

বিজু গম্ভীর মুখে বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিল। গেটের বাইরে এসে বেলা বলল, 'হোলো না, না ?'

বিজু বলল, 'না।'

বেলা বলল, 'আমি আগেই জানতুম। মিছামিছি আপনি আমার জন্যে এত কষ্ট করলেন।'

বিজুর মনে পড়ল নিজেও বহু বার সে এমন ব্যর্থ ইণ্টারভিউ দিয়েছে। কত অফিস আর কত কলেজের দোরে গিয়ে যে ধন্না দিয়েছে তার ঠিক নেই।

বাইরে এসে দেখে ছুটি বাচ্চা ছেলে নিয়ে এক যুবক ভদ্রলোক আর তাঁর তরুণী স্ত্রী অভয়ের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

বিজুকে দেখে অভয় একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'এঁরা বলছেন দক্ষিণেশ্বর যাবেন। কি করি বলুন তো?'

বিজু বলল, 'বেশ তো।'

বেলা বলল, 'তুমি যাও না বাবা; আমরা বাসেই ফিরে যাব।'

বাসে ওঠার আগে বেলাকে নিয়ে ছোট একটি চায়ের দোকানে ঢুকল বিজু। বলল "আসুন, একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক।"

বেলা আপত্তি করল না। কিন্তু দাম দেওয়ার বেলায় বলল, 'উঁহু, আমি দেব। চায়ের নিমন্ত্রণ আমিই আপনাকে প্রথম করেছিলাম।'

বিজু হার মেনে বলল, 'বেশ, দিন।'

বাসে যেতে যেতে বিজু বেলাকে কথা দিল, 'আপনার চাকরি জোগাড় ক'রে দিতে পারলাম না, কিন্তু যে ভাবেই পারি, কিছু-না কিছু কাজ আপনাকে দেবই।'

বেলা বলল, 'দেখবেন, তাতে আপনার নিজের কাজের যেন কোন ক্ষতি না হয়।'

গবেষণার জন্য শ'খানেক টাকা ক'রে বিজু এলাউন্স পেত। তা তার নিজের খরচেই লাগত। সেই টাকা দিয়ে একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটার বেলাকে কিনে দিল বিজু। অভয় আর বেলা তো কিছুতেই নেবে না।

বিজু বলল, 'তাতে কি হয়েছে। আপনারা ক্রমে ক্রমে শোধ দেবেন। সামান্যই তো টাকা।'

শুধু টাইপ-রাইটার নয়, টাইপের কাজও কিছু কিছু বেলাকে এনে দিতে লাগল বিজু। তারপর একদিন একটা বড় প্রবন্ধ এনে বেলাকে বলল, 'ভালো ক'রে টাইপ করবেন। লেখাটা জার্মাণীতে যাবে।'

বেলা বলল, 'আচ্ছা।'

দিন তিনেক লাগল বেলার কাজটা শেষ করতে। বিজু খুব খুসি হোলো। কোন রকম ভুল হয়নি। খুবই পরিচ্ছন্ন হয়েছে টাইপ।

বিজু পকেট থেকে টাকা বের করতে যাচ্ছিল, বেলা বাধা দিয়ে বলল, "ও কি হচ্ছে?"

বিজু বলল, "বাঃ, কাজের দাম নেবেন না?"

বস্তির ঘরের মধ্যে তখন আর কেউ ছিল না। বেলার মা রান্না করছিলেন। অভয় গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। ভিতরের উঠানে মাদুর পেতে হ্যারিকেন জ্বেলে পড়তে বসেছিল ছোট ভাই-বোনেরা। ঘরের এক কোণে একটি টিপায়ার ওপর আর একটি চিমনি-ফাটা ছোট হ্যারিকেন জ্বলছিল. সেই :আলোয় বৈজ্ঞানিক দেখল বেলার দু'চোখ ছল-ছল ক'রে উঠেছে।

বেলা বলল, "আমরা গরীব, টাকা আমাদের দরকার। কিন্তু সে টাকা কি আপনার থিসিস টাইপ ক'রে দেওয়ার বদলেও নিতে হবে?"

বিজু মুহূর্তকাল তার দিকে চেয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, "থাক, তাহলে আর তোমার নিয়ে দরকার নেই।"

যে মেয়ে কাজের বদলে টাকা নেয় না, তাকে তো কিছু দিতেই হয়। বিজু তাই মন-প্রাণ দিয়ে দিয়েছে।

ভবেশ তার কাহিনী শেষ করল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "শেষ পর্যন্ত সেই বেলাকেই বিয়ে করল তাহ'লে?'

ভবেশ বলল, "আবার কি। বড় একগুঁয়ে ছেলে. আগে চিনতে পারিনি। চুপচাপ থাকত, এখন দেখি ওর রোখ ভারি সাংঘাতিক। মা-বাপ, দিদি-ভগিনীপতি—কারো অনুরোধ শুনল না. চোখ-রাঙানী মানল না,—যা করবার তা করলই। কি দুঃসাহস দেখ!'

হেসে বললাম "দুঃসাহস বই কি। একেবারে দুঃসাহসী কলম্বাস। ভালো কথা, ওর আমিরিকা যাওয়ার কি হোলো?"

ভবেশ বলল, "এখনকার মত সে অফার ত হাতছাড়া। প্যাসেজ মানি জোটেনি। কিন্তু না জুটলেও ওর উদ্যম আরো বেড়ে গেছে। ইউরোপ-আমেরিকার সব দেশগুলিতে ওর থিসিসের টাইপ-করা কপি পাঠাচ্ছে। কিছু কিছু অফার নাকি আসছেও। মনে হয়, ও সাগর-পারে না গিয়ে ছাড়বে না।" ভবেশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একটু হাসল, "সাঁতরে গেলেও যাবে।"

পুরাতনী

সিঁড়ির মুখে দেখা হতেই রিনা বলে উঠল, "ইশ্ একটুর জন্যে তুমি সুযোগটা হারালে।"

বললাম, "কী ব্যাপার?"

রিনা বলল, "আমার এক বান্ধবী এইমাত্র চলে গেল। পাঁচ মিনিট আগে এলে তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যেত।"

বললাম, "আমি আমার নিজের বান্ধবী ছাড়া আর কারো বান্ধবী সম্বন্ধে উৎসাহী নই।"

আমার আগে আগে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে রিনা ঘাড় ফিরিয়ে মুখ টিপে একটু হাসল। "দেখ, আর যাই কর, আমার কাছে মিছে কথা বল না। বলে সেরে যেতে পারবে না। আমি তোমাকে চিনি।"

প্রশস্ত ছাদের মাঝখানে নিচু গোল টেবিল পাতা। তার চারদিক ঘিরে খান তিনেক বেতের চেয়ার। আমি তার একটি টেনে নিয়ে বসতেই রিনা বলল, "একটু আগে আমার সেই বান্ধবীটি এখানে ছিল। তোমার ওই চেয়ারটাতেই বসেছিল। তোমার নাক যত বড়, ঘ্রাণশক্তি যদি তত তীব্র হত তাহলে এখনো হাওয়ায় তার গায়ের গন্ধ পেতে।"

হেসে বললাম, "পুরোবর্তিনীর পাউডারের সৌরভ নেপথ্যবর্তিনীকে ঢেকে দিয়েছে। আমার নাকের কোন দোষ নেই।"

রিনা বলল, "দোষটা তোমার নাকের নয়, চোখের। নতুন মুখ দেখলে তোমার দুটি চোখ সেখান থেকে নড়তে চায় না।

তুমি নিজের মুখেই স্বীকার করেছ, তোমার দেশভ্রমণের কোন আগ্রহ নেই। একেকটি মেয়েই তোমার কাছে একেকটি দেশ, একেকটি দুনিয়া।”

বললাম, “কথাটা একটু শুধরে নাও। মেয়ে কেটে মানুষ কর। একেকটি মানুষ আমার কাছে একেকটি দুনিয়া এ-কথা ঠিক। সেই দুনিয়া দেখবার জন্যে আমার দূর দেশে যাওয়ার দরকার হয় না। এমন কি, অন্য গ্রাম অন্য নগরেও নয়। আমি তাদের ঘরে বসেই দেখতে পাই। বড়জোর দু পা বাড়িয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেই হল।”

আমার কথার মধ্যে যে কোন যুক্তি নেই, সত্যতাও নেই, তা বলবার জন্যে রিনা একটু হাসল। হাসলে যে ওকে সুন্দর দেখায়, তা ও জানে। নিজের দাঁতগুলির শুভ্রচারুতা সম্বন্ধে ও সচেতন। হাসিতে যদি ক্ষণেকের জন্যে কথা ঢাকা পড়ে, ওর বন্ধুরা তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ তারা যখন ওকে দিয়ে কথা বলায়, তা কান পেতে শোনার জন্যে বলায় না, চোখ পেতে ওর বাঙ্ময় রূপ দেখবার জন্যে তর্কের অবতারণা করে। কিন্তু রিনা সে-কথা মনে রাখে না। কথা বলায় ওর আনন্দ। কথা বলতে ও ভালবাসে। কথা বলতে ও জানেও। বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত শ্রোতা উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। আত্মপ্রকাশ হয় লক্ষ্য।

আর এখন কথা ছাড়া ওর কোন কাজ নেই। রিনা ধনী ব্যারিস্টারের মেয়ে। ওর নিজের নামেও হাজার কয়েক টাকা জমা আছে। সে-টাকায় ইউরোপ যাওয়া না গেলেও কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত যাওয়া যায়। কলকাতা যখন একঘেয়ে লাগে, মাঝে মাঝে ও গা ঢাকা দেয়। আসলে মুখ ঢাকাই ওর উদ্দেশ্য। ওদের সমাজে পর্দার প্রচলন নেই। তাই অন্তরালের জন্যে ওর মাঝে মাঝে দেশান্তরী হবার দরকার হয়। আমাকে রিনা মাঝে মাঝে কুনো বলে খোঁচা দেয়। কারণ আমি ঘর থেকে

বড় একটা বেরোই না। মানে এই শহর থেকে। আসলে আমার দুখানি পা থাকা সত্ত্বেও চলচ্ছক্তি কম। তাই বলে যে বেরোবার সাধ নেই তা নয়। নতুন দেশের স্বাদ ঘরের কোণে বসে মেলে না। সে-কথা আমি মনে মনে মানি। কিন্তু মুখে স্বীকার করিনে। বলি, মনোরথের তুল্য রথ নেই। বলি, সব চেয়ে দূর আর দুর্গম হল বন্ধুজনের অন্তরদেশ। আমার দেশান্তরে যাওয়ার দরকার কী।

রিনা আমার মত নয়। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে ও অনেক জায়গা ঘুরেছে, অনেক মাটি মানুষ আর মনের স্পর্শ পেয়েছে। দু দু বার বিয়ের বাঁধন ছিঁড়েছে। আরও কয়েকবার বাঁধনে ধরা পড়তে পড়তে সরে এসেছে। বজ্র আঁটুনি আর ফস্কা গেরো যে কতবার হয়েছে তার তো ঠিক-ঠিকানাই নেই। জীবন সম্বন্ধে ওর অভিজ্ঞতা বিচিত্র, শুধু দেখা নয় শোনা নয়।

ছুটোছুটির ফাঁকে ফাঁকে জীবন সম্বন্ধে ও বসে বসে ভেবেছেও। ওর অনেক কথাই হয়ত বই পড়ে পড়ে না হয় বন্ধুদের মুখ থেকে শুনে শুনে মুখস্ত করা। কিন্তু তাতে দোষ কী। আমরা কজন আর সংসারে মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করতে আসি। পাঁচজনের মুখের কথাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে পঞ্চামৃতের স্বাদ আনা যায়, যদি তাতে আত্মোপলব্ধির দু-একটি ছিঁটেফোঁটাও অন্তত থাকে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে, রিনার তা আছে। শেখা বুলি আওড়ালেও ও নিজের গলায় আওড়ায়।

আমার সঙ্গে যখন ওর আলাপ, ও তখন বিশ্রাম নিচ্ছে। কর্ম থেকে বিশ্রাম নয়, নর্ম থেকে বিশ্রাম। জীবিকার জন্যে কখনো ওকে কোন পরিশ্রম করতে হয়নি।

জীবনের অভিজ্ঞতায় সেই ওর বড় রকমের ঘাটতি। রিনা অবশ্য সে-কথা স্বীকার করে না। বলে, "মাষ্টারি কি কেরানীগিরি না করলে, হাসপাতালের নার্স কি অফিসের স্টেনো না হলে আধুনিক মেয়ের জীবন মাটি হয়ে যায়, এ-কথা আমি মানিনে।"

আমি বলি, "বেশ, তাহলে কোন আর্টের দিকে যাও। নাচ গান, ছবি আঁকা সাহিত্য কি অভিনয়, রাজনীতি কি সমাজসংস্কার—"

রিনা ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, "কিছু না কিছু না। আমি কিছু না করে শুধু বেঁচে থাকব। আমার অস্তিত্বই এক উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি। সব রকমের সংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র এক প্রতিবাদ।"

বলি, "অনভ্যাসে বিদ্যা যে হ্রাস পাবে। বুদ্ধিতে মরচে পড়বে।"

রিনা হেসে বলে, "সেই বুঝি হয়েছে তোমার মহা ভাবনা। অনেকদিন আগেই বিদ্যেকে গলিয়ে চোখের সুর্মার সঙ্গে মিশিয়েছি, আর বুদ্ধিকে লিপস্টিকে। যাতে আমার বন্ধুদের নয়ন মন দুইই রঞ্জিত হয়। দুনিয়ায় এ ছাড়া আমার আর কোন কাজ নেই।"

রিনার সব কথাই এই ধরনের শ্লেষ, ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপে শাণিত। কিন্তু এত অস্ত্র চালনা যে কার বিরুদ্ধে তা সব সময় বোঝা যায় না। অনেক সময় মনে হয়, ও হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করছে।

এ-গল্প রিনা চৌধুরীকে নিয়ে নয়। তবু যে তার সম্বন্ধে এত কথা বলছি তার কারণ গল্পটা রিনার মুখ থেকে শোনা। মুখবন্ধের আকারে সেই মুখশ্রীর যদি একটু বন্দনা করি পাঠকরা অপরাধ নেবেন না।

চাকর এসে চায়ের পট রেখে গেল। রিনা একবার সেদিকে একটু তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "কিন্তু চিত্রাকে দেখলে, তার সঙ্গে আলাপ করলে, তোমার পক্ষে লাভ হত। ওর জীবনে বেশ বড় একটা কাহিনী আছে।"

বললাম, "কাহিনী তোমার জীবনেই বা এমন কি কম। আর তুমি জীবন দিতে না চাইলেও জীবনীর দুচার অধ্যায় ত দিয়েছ।"

রিনা বলল, "দিয়েছি। কিন্তু সে-দেওয়া ধোপাকে কাপড় দেওয়ার মত। বন্ধুকে বই ধার দেওয়ার মত। তুমি আমার জীবনীর দু-এক অধ্যায় অধ্যয়ন করতে পার, কিন্তু তা মুখস্থ লিখতে পারবে না।"

বললাম, "মুখস্ত আমি কিছু লিখিনে। মেয়েদের মনের কথাই হক, আর মুখের কথাই হক, আমার কলমের মুখে পড়লে তা আপনিই সূচিমুখ হয়ে ওঠে। তার রূপ আগা-গোড়া পালটে যায়।"

রিনা বলল, "যাকগে, চিত্রার কথা তুমি শুনবে কি শুনবে না এক কথায় বলে দাও।"

ধমকের ভঙ্গিটুকু উপভোগ করে বললাম, "আচ্ছা বল।"

রিনা খুসি হয়ে বলতে শুরু করল।

"ওর পুরোনাম ছিল চিত্রাঙ্গদা চট্টোপাধ্যায়। ওর বাবা যে তোমার মতই অনুপ্রাসের ভক্ত ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। চিত্রার বাবা শ্রীপদ চাটুজ্যেকে আমরা কাকাবাবু বলে ডাকতাম। তিনি ছিলেন আমার বাবার বন্ধু। তাই হিসেবমত চিত্রার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব পুরুষানুক্রমিক কিন্তু আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে বিশেষ কোন মিল ছিল না। চিত্রারা জাতে বামুন, ধর্মে খ্রীষ্টান। শ্রীপদবাবু ধর্মের অনুষ্ঠানের দিকটা তেমন না মানলেও, নীতির দিকটা বিশেষ করেই মানতেন। মদ খেতেন না, পারতপক্ষে মিথ্যে কথা বলতেন না। লোকের সঙ্গে অসদ্ব্যবহারের কোন সুযোগই তাঁর ছিল না। কারণ মানুষের সঙ্গে বেশী মেলামেশা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। মিশনারি কলেজে পড়াতেন। স্বার্থপর খেলোয়াড়ের মত তিনি ছিলেন স্বার্থপর অধ্যাপক। নিজের মনে পড়িয়ে যেতেন, ছাত্রদের সহযোগিতা বেশী চাইতেন না। তবু তাঁর নাম যশ ছিল। সৎ মানুষ হিসাবে আশপাশের সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। শ্রদ্ধা করত কিন্তু গ্রাহ্য করত না। রাঁচি রোডে ওঁদের বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে তখন আমাদের বাড়ি। হাওয়াটাও যে একটু উল্টো রকমের ছিল তা আমাকে দেখেই বুঝতে পারছ। হাইকোর্টে পসার আর শহরে প্রতিপত্তি, দুই-ই আমার বাবার আছে। তাঁর পেশা সুবোধ ছেলে পড়ানো নয়। যে-সব মক্কেল নিয়ে তাঁর কারবার, তাঁরা সবাই কিছু যুধিষ্ঠির ছিলেন না। কিন্তু

কোর্টে গিয়ে দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানাবার মত মাথার জোর ছিল বাবার, মুখের জোর ছিল। সেই জাদুকরী শক্তি খানিকটা আমি পেয়েছি। অশনে-বসনে পোষাকে-আসবাবে রীতিতে-নীতিতে আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে মিল ছিল না। তবু চিত্রার সঙ্গে আমার ভাব জমে গিয়েছিল। আমরা একই স্কুলে পরে একই কলেজে পড়েছি। এক ক্লাশে এক বেঞ্চে পাশাপাশি বসেছি। তার ফলে কিছুটা বন্ধুত্ব আপনা থেকেই হয়ে গেছে। আমি পড়াশুনো না করে আর দিনরাত আড্ডা ইয়ার্কি দিয়ে বেড়িয়েও চিত্রার চেয়ে চিরকাল বেশী নম্বর পেয়েছি। তার ফলে কাকাবাবুর কাছে আমার খানিকটা বেশী খাতির ছিল। তা ছাড়া চিত্রা যা করতে সাহস পেত না, আমি তা পেতাম। কাকাবাবুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতাম। ভালটা কেন ভাল, মন্দটা কেন খারাপ তা জানতে চাইতাম। চিত্রার মত বিনা বিচারে সব কথা মেনে নিতাম না। কাকাবাবু যদিও আড়ালে-আবডালে অকালপক্ক বলে আমাকে গাল দিতেন, কিন্তু সামনে গেলে অনাদর করতে পারতেন না। পরে শুনেছি আমার অনেক কথা তাঁর মনে চিন্তার উদ্রেক করেছে। সেই চিন্তা থেকে জন্ম নিয়েছে প্রবন্ধ।

"তোমার কাছে বিনয় করব না। কারণ বিনয় তোমার ভূষণ হতে পারে আমার নয়। দেখতেই পাচ্ছ হাতে কানে গলায় আমার আলাদা আলাদা গয়না আছে। আর তোমার বিনয় ছাড়া কিছুই নেই। চিত্রা আমার চেয়ে রূপে গুণে নিরেস ছিল, এ কথা বললে শিষ্টাচারের যদি নিয়মভঙ্গ হয় হক। চিত্রার রঙ শ্যামলা, নাক চোখ খুব চোখা নয়। ছিপছিপে একহারা গড়ন। তবু লোকে বলত ওর মুখে মিষ্টত্ব বেশী, চেহারায় হাঁটা চলায় ও একেবারে সেন্ট পারসেন্ট মেয়ে। আমি ঈর্ষায় জ্বলতাম। তুলনাটা যে কার সঙ্গে তা কেউ উল্লেখ না করলেও আমার

বুঝতে বাকী থাকত না। মনে মনে বলতাম আমি চাইনে ওর মত হতে। ও যদি লতা হয়, আমি ধারালো তলোয়ার। আমি বীরের হাতের বিদ্রোহীর হাতের অস্ত্র। ছেলেরা বারবার ওর দিকে তাকাত। কিন্তু কাছে ঘেঁষতে উৎসাহ পেত না। চিত্রা মিষ্টি মেয়ে কিন্তু বড় ঠাণ্ডা, বড় শান্ত, বিষণ্ণ আর গম্ভীর। ও যেন ট্র্যাজেডির নায়িকা হওয়ার জন্যেই জন্মেছে।

"অবশ্য কিছুটা দুঃখের কারণ ছিল। অল্প বয়সে ওর মা মারা যায়। বাপ ত সংসারে থেকেও আধা সন্ন্যাসী ছিলেন। বউ মারা যাওয়ার পর বইয়ের মধ্যে আরো বেশী করে ডুবে গেলেন। চিত্রার এক বিধবা বুড়ী পিসিমা এসে ভার নিলেন সংসারের। ভারী শুচিবাই ছিল চিত্রার পিসিমার। দু-তিন পুরুষ ধরে ক্রিশ্চিয়ান হলেও হিন্দুয়ানির অনেক সংস্কারই তিনি ছাড়তে পারেননি। কেবল গীতার বদলে বাংলা বাইবেল পড়া আর রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের বদলে একমাত্র যীশুখ্রীষ্টের ছবির নীচে মোমবাতি জ্বালানো ছাড়া হিন্দুদের সঙ্গে বিশেষ কোন তফাৎ তাঁর ছিল না। ভূত প্রেত তাবিজ কবচ এমন জিনিস নেই যা তিনি মানতেন না। চিত্রাকে তিনি প্রায়ই বকতেন। বাইরের কোন ছেলের সঙ্গে তাকে মিশতে দিতেন না। আর আমার মত মেয়ে ত ছেলেরও বাড়া। তখন আমার বয়স চোদ্দ-পনেরর বেশী নয়। কিন্তু সেই বয়সেই চিত্রার পিসি আমাকে নষ্ট আর বজ্জাত বলে গাল দিতে শুরু করেছিলেন। অবশ্য আমি যে নিরীহ আশ্রমমৃগী ছিলাম তা নয়। তখন থেকেই পুরুষের চোখ আর চিত্ত আমাকে দেখে চঞ্চল হত। বিশেষ করে যাঁদের বয়স চল্লিশ কি পঞ্চাশের উপরে তাঁরা আমাকে কিছুতেই কাছছাড়া করতে চাইতেন না। মুশকিল এই যে, আমি তাঁদের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গির মানে বুঝতাম। সুবিধেমত অবশ্য না-বুঝবার ভান করতাম। তাতে যদি আবার তাঁদের সুবিধে বাড়ত, পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতাম যে, আমি সব বুঝেছি। যা হোক, দোষ থাকলে

আমি তা কবুল করতে রাজি ছিলাম না। অন্যের মুখে তা শুনতে আমার আরো আপত্তি ছিল। তাই চিত্রার পিসি যেমন আমাকে দু-চোখে দেখতে পারতেন না; তিনিও তেমনি আমার চক্ষুশূল ছিলেন। শুধু আমি একা নই, আমার ছোট ভাইবোনেদেরও ওই বুড়ীর পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিলাম। তারা চিত্রার পিসিকে দেখে ভেংচি কাটত, আর ছড়া কাটত। আর তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। গালি-গালাজ শাপ-শাপান্তের আর অন্ত থাকত না।

"চিত্রাও হাসত। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হলে গম্ভীর মুখে অনুযোগ দিয়ে বলত আমার পিসির সঙ্গে অমন করে লাগিস কেন? বুড়োমানুষ কষ্ট হয় না?'

"আমি বলতাম, কষ্ট না ঘোড়ার ডিম হয়। ওই বুড়ী কেন পাড়া ভরে আমার অমন নিন্দে-মন্দ করে? কেন তোর কাছে শুধু আমাকে ঘেষতে দেয় না? আমি কি পচাআপেল যে কাছে এলেই তোর গায়ে দাগ লাগবে?'

"চিত্রা হেসে বলত, 'আহা বাড়ির বাইরেও ত আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। ভিতরে না হয় নাই হল।'

"ওর এই নির্লিপ্ততা দেখে আমার ভারী রাগ হত। মনে মনে ভাবতাম, পিসিকে ত পারব না, কিন্তু এই পিসিসোহাগী ভাইঝিকে আমি একদিন বখাবই বখাব। তার জন্যে যদি আমার সব চেয়ে সেরা ভক্তকে ছেড়ে দিতে হয় তাতেও রাজী আছি।

"আমার মাও বারণ করতেন! বলতেন, 'ওরা যখন চায় না, যাসনে ওদের বাড়িতে। মিশিসনে ওদের সঙ্গে।'

"আমি বলতাম, 'বয়ে গেছে ওই বুড়ীর বাড়িতে যেতে।'

"বুড়ীর বাড়ী থেকে আস্তে আস্তে ও-বাড়ির নাম হয়ে গেল 'ছাট ওল্ড অ্যাণ্ড এনসিয়েন্ট ওয়ার্ল্ড'। নামটা আমার ছোটভাই অন্তুই মাথা থেকে বার করলে। শুধু আমাদের বাড়ির নয়, পাড়া ভরে বাচ্চা ছেলেমেয়ে আর কুকুরছানার নতুন নতুন

নাম রেখে তার যশ বেড়েছে। তার দেওয়া চিত্রাদের বাড়ির এই নামটা আমরা সবাই লুফে নিলাম। ঠিক উপযুক্ত নাম হয়েছে। ও বাড়িতে শুধু যে একজন শুচিবায়ুগ্রস্ত বুড়ী আছে তাই নয়, ও-বাড়ির সবই পুরনো। ছুটো ইউকালিপটাস গাছের আড়ালে চুনবালিঝরা চেহারাটা যেমন প্রাচীন, ভিতরের বাসিন্দা কটিও তেমনি, এ-কালের হয়েও পুরনো আমলের মানুষ। এমন কি, চিত্রার গায়েও পুরনো গন্ধ, পুরনো পোশাক, মন ভরা পুরনো দিনের সংস্কার। ও-বাড়ির উপযুক্ত নাম পুরনো ছুনিয়া। নামটা কেন যে আমাদের আগে স্ট্রাইক করেনি, এইটেই আশ্চর্য।

"তারপর পুরনো ছুনিয়া থেকেও চিত্রার বুড়ী পিসিমা একদিন সরে গেলেন। মারা গেলেন তিন-চারদিনের জ্বরে। চিত্রা কেঁদে আকুল হল। তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আমিও যে কেন চোখের জল ফেললাম, তা জানিনে। সারা পাড়াটা যেন কিছুদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। ভারী ফাঁকা আর খালি-খালি লাগতে লাগল। শত্রুপক্ষ যদি এমন নির্মূল হয়ে যায়, লড়ব কার সঙ্গে।

"চিত্রাদের বাড়ির দোর আবার আমার কাছে নিষ্কণ্টক হল। কাকাবাবুও আমাকে মাঝে-মাঝে ডেকে পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু ও-বাড়িতে তখন আমার যাওয়ার সময় কম। এ পাড়ায় ও-পাড়ায় আরো অনেক বাড়ির ড্রয়িংরুমে তখন আমার জন্যে প্রতীক্ষা করে। পার্টি পিকনিকের ভিড় ঠেলে কূল পাইনে। আমাদের বাড়ির অতিথি অভ্যাগতের সংখ্যা বেড়েছে। তাঁদের মধ্যে শুধু এ দেশী নয়, বিদেশী বন্ধুরাও আছেন। তাঁদের জন্যে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কারণ আমার জন্যেও তাঁরা কেউ কেউ ব্যস্ত থাকতে ভালবাসেন। আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। কিন্তু কলেজের লেডী প্রিন্সিপ্যালের চাইতেও আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি তখন বেশী। তাঁর আধিপত্য শুধু কলেজের গণ্ডিটুকুর মধ্যে। কিন্তু আমার ছুনিয়া না মানে মানা, না মানে সীমানা।

"এর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটল। চিত্রার সেই বুড়ী পিসিমা মারা যাওয়ার পর আর কোন মামীমা-মাসিমাকে তার বাবা বাড়িতে আনলেন না। দিদির চালচলন আর ব্যবহারে তিনিও বোধ হয় বিরক্ত আর বিব্রত হয়েছিলেন। এবার কলেজ থেকে ধরে আনলেন এক বেয়ারাকে। সে একেবারে সব্যসাচী। একাধারে ঠাকুর চাকর মালী দারোয়ান। এর আগে চিত্রার পিসিমার আমলে কোন ঝি-চাকর এসে ছু চারদিনের বেশী টিঁকতে পারত না। কিন্তু চিত্রাদের এই নতুন চাকরটি বেশ টিঁকে গেল। ওর কাছেই শুনলাম, লোকটির নাম অভয়। বছর পঁচিশ ছাব্বিশ হবে বয়স। গায়ের রঙ পাথরের মত কালো। কিন্তু নাক চোক ঠোঁট চিবুক যেন পাথর থেকেই সেকালের কোন শিল্পী কুঁদে বার করেছে। বেশ লম্বা স্বাস্থ্যবান চেহারা। মুখশ্রীটুকু সুন্দর। হঠাৎ মনে হয় না যে, পেটে কোন বিদ্যেবুদ্ধি নেই। বরং চোখ ছুটি দেখলে মনে হয়, বেশ খানিকটা ছুষ্টুবুদ্ধি রাখে।

"অন্ত ওর নাম দিল বিষ্ণুমূর্তি। কিন্তু নামটা চাকরের পক্ষে বেশী সম্ভ্রান্ত বলে তেমন চালু হল না। অভয় যখন প্রথম এসেছিল, ওর মাথায় ছিল কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুল, পরনে ডোরাকাটা পাজামা। কিন্তু চিত্রা নাপিত ডেকে ওর চুল ছোট করে ছাঁটিয়ে নিল। পাজামা ছাড়িয়ে ধুতি পরাল। তেরছি কলার জামাটা ছিঁড়ে ফেলে ছিটের হাফশার্ট, আর বাইরে বেরোবার জন্যে ভদ্রদর্শন সাদা পাঞ্জাবি করিয়ে দিল। একেকটি পোষাক বদলানো হয় আর অভয়ের অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে ওঠে। পোশাক ত নয়, যেন ওর গায়ের চামড়া কেউ ছাড়িয়ে নিচ্ছে। আমার সঙ্গে দেখা হলে প্রায়ই চিত্রার বিরুদ্ধে নালিশ জানায়৹ "দেখুন তো ওঁদের কাণ্ড। আমার খুশিমত আমি জামাজুতো পরব, তাও ওঁদের সইবে না। কী অত্যাচার। চাকরি করতে এসেছি বলে কি মাথা বিকিয়ে দিয়েছি? শুনে আমি হেসে বলি৹ 'কী আর

করবে বল। চিত্রা যা বলে ভালর জন্যেই বলে। তোমাকে ভদ্র আর সুন্দর দেখাবে বলেই বলে। জানত ত আপরুচি খানা, পররুচি পরনা। আমরা সবাই তাই করি। পরের জন্যে পরি।'

"কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের চাকর দারোয়ানের সঙ্গে অভয় এসে তাস খেলত, আড্ডা দিত। চিত্রার তাতেও আপত্তি। বলে, 'অত সময় নষ্ট করবে কেন? বাড়িতে কি আর কোন কাজ নেই?'

"এ কথা শুনে আমি একদিন চিত্রাকে ডেকে বললাম, 'ব্যাপার কি চিত্রা? তুই ত এ রকম ছিলিনে। নিজের পড়াশুনো নিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকতিস। হঠাৎ এমন সমাজ সংস্কারক হয়ে পড়িল কেন?'

"চিত্রা বিস্মিত হয়ে বলল, 'সমাজ সংস্কার!'

"আমি বললাম, 'ওই হল, চাকর সংস্কার।'

"চিত্রা গম্ভীর হয়ে বলল, 'অভয়ের চালচলনটা একটু শুধরে দেওয়া দরকার।'

"বললাম তা ঠিক। বাড়ির কালচারের এরাই ত বাহক। জানলার পর্দা, টেবিলের ঢাকনি, ঠাকুর চাকর, কুকুর বেড়াল, গৃহ-স্বামিনীর সংস্কৃতি এদের ভিতর দিয়েই ত ফুটে বেরোয়।'

"চিত্রা বিরক্ত হয়ে বলল, 'সব সময় ঠাট্টাইয়ার্কি ভাল লাগে না রিনা।'

"আমি লক্ষ্য করলাম চিত্রার আগের সেই সহিষ্ণুতা নেই, ওর মেজাজটা কেমন যেন বিগড়ে রয়েছে। আমার বুঝতে কিছু বাকী রইল না। চিত্রার বাবার এক ভক্ত ছাত্র ছিল, নাম অমরেশ মুখুজ্যে। তার প্রসঙ্গ উঠলে চিত্রার মুখের রঙ বদলাত। কিন্তু মেয়েটি এত লাজুক, এত চাপা, এত সেকেলে যে, কিছুতেই ওর মুখ থেকে মনের কথা বার করে নিতে পারিনি। সেই অমরেশ হঠাৎ একদিন যাওয়া আসা বন্ধ করে দিল। বিয়ে করল এক ধনী ব্রাহ্মণ পরিবারে। জান ত, পুরুষের নিন্দায় আমি পঞ্চমুখ। আমি যাদের দেখেছি তাদের

মধ্যে বেশীর ভাগই কুপুরুষ। শুধু রূপের দিক থেকে নয়, গুণের দিক থেকেও। তবু বেচারা অমরেশকে বেশী দোষ দিতে পারিনে। কারণ চিত্রার ধরণ ধারণই একটু আলাদা। কোন ছেলেকেই ও উৎসাহ দিতে জানে না। তা সে কৃত্রিমই হক, আর অকৃত্রিমই হক। কিছুটা ও যেন ওর বাবার স্বভাব পেয়েছে। তিনি যেমন নিজের মধ্যে ডুবে থাকতেন, চিত্রাও তাই। দেখতে দেখতে নিজের মধ্যে তলিয়ে যেত। কিন্তু সংসারে ডুবুরির সংখ্যা কম, সাঁতারুর সংখ্যা বেশী। এমন কোন ডুবুরী আছে যে ওকে সেই সমুদ্রতল থেকে তুলে আনবে? তারপর মজুরি যে পোষাবে, এমন গ্যারান্টি কই? চিত্রার দিকে আমার বাছা বাছা বন্ধুদের চোখ আকৃষ্ট করে দেখেছি। তারা সবাই এক পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে এসেছে। চিত্রার সঙ্গে প্রতিযোগিতার আমার বড়ই সাধ ছিল। দেখতাম কে হারে কে জেতে। লতা না বিদ্যুৎলতা। কিন্তু বড় ভীরু মেয়ে চিত্রা। ও দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামলই না। ওর একমাত্র আনন্দ অন্তর্দ্বন্দ্বে।

"ইতিমধ্যে আমার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটল। আমি নিজেই ঘটালাম! অঘটনঘটনপটিয়সীর গৌরব আর কাউকে দিতে চাইনে। এক পাঞ্জাবী শিখকে বিয়ে করে ছেড়ে গেলাম তোমাদের বাংলা দেশ। ফিরে এলাম দু-বছর বাদে। আমি ছেলে হলে বাবা আমাকে ঘটা করে ত্যাগ করতেন। মেয়ে বলে মনে মনে ছাড়লেন। কিন্তু তাই বলে মৌখিক ভদ্রতার সম্পর্কটুকু দূর হল না। বাড়ীর সকলের সঙ্গে একই টেবিলে বসে খাই, গল্প করি। মন নিয়ে কেউ মাথা ঘামাইনে, মেজাজ ভাল রাখতে পারলেই হল।

"ফিরে এসে শুনতে পেলাম চিত্রাও এক কাণ্ড করেছে। তার কৃতিত্ব আমার চেয়ে কম নয়। বাড়ির চাকর অভয়কে নিয়ে সে পলাতকা। পৃথিবীর কিছুই আমাকে বিস্মিত করতে পারে না। কিন্তু চিত্রার এই খবরে আমিও খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইলাম।

চিত্রার মত মেয়ে এমন কাণ্ড করতে পারে, তা যে স্বচক্ষে দেখলেও চোখ রগড়ে ভাবতে হয়, স্বপ্ন দেখছি কি না। আস্তে আস্তে জেনে নিলাম সব বৃত্তান্ত। বোনদের মুখে, বন্ধুদের মুখে। চিত্রার নিন্দায় একেক জনের পাঁচখানা করে মুখ বার হল। মেয়েটা যে মিটমিটে শয়তান তা নাকি সবাই আগে থেকে টের পেয়েছিল। দেখলে মনে হত ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। কিন্তু আসলে তা নয়। নিজেদের সমাজে এত ভাল ভাল ছেলে থাকতে শেষ পর্যন্ত কিনা বাড়ির চাকরটাকে পছন্দ করল! দেহ ছাড়া আর কি আছে অভয়ের। ছি-ছি-ছি। কী রুচি মেয়েটার, কী প্রবৃত্তি।

"আমি কিন্তু খুশি হলাম। বেশ করেছে, ঠিক করেছে। এতদিনে ওদের পুরানো তুনিয়া খানখান করে ভেঙে পড়েছে। মরেছে ওদের ভূতের ভয়। আহা, এ-সময়ে যদি চিত্রার সেই বুড়ী পিসিমা বেঁচে থাকতেন, তাহলে কী মজাটাই না হত। তিনি তো নেই-ই, চিত্রার বাবাও বাড়ি ছেড়ে, পাড়া ছেড়ে, শুনলাম কলকাতা সহর ছেড়েই কোথায় চলে গেছেন।

"চিত্রাদের সেই ছোট্ট দোতলা বাড়িটা ছিল ভাড়াটে বাড়ি। তার মালিক এসে ইঞ্জিনিয়ার মিস্ত্রি লাগিয়ে সেই পুরনো বাড়িটার নতুন চেহারা দিলেন। বাড়ির রঙ বদলাল, রূপ বদলাল। নীচে উপরে তুখানা করে ফ্ল্যাট হল। সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটেও এসে গেল। আর তা দেখে দেখে আমার মনের এক এক নির্জন কোণ গোপনে হাহাকার করে উঠল। ঠিক চিত্রার বুড়ী পিসিমা মারা যাওয়ার সময় যেমন করেছিল। এত অদল-বদল সত্ত্বেও আমার মন থেকে সেই পুরনো বাড়ির ছবিটা একেবারে মুছে গেল না। বার বার চিত্রার মুখখানা মনে পড়তে লাগল। আহা কতদিনের জানাশোনা ওর সঙ্গে, কতদিনের বন্ধুত্ব। বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে। কোন্ প্রণয়েই বা নেই। তবু ছেলেবেলার ভালবাসার সঙ্গে আর কিছুর তুলনা চলে না।"

রিনা তার গল্প থামিয়ে একটুকাল চুপ করে রইল।

আমি বললাম, "ব্যাপার কী। চিত্রাদের সেই পুরনো ঢুনিয়াটা কি শেষ পর্যন্ত তোমার মনে এসে বাসা বাঁধল ?"

রিনা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল, "না না, আমার মনে সহজে কোন কিছু বাসা বাঁধে না। আমার কথা ছেড়ে দাও। যা বলছি তাই শোন। চিত্রার কথা আমার মনে পড়তে লাগল। আর সেই সঙ্গে অভয়ের কথা। আশ্চর্য, যতই বলিনে কেন, চিত্রার পাশে অভয়কে দাঁড় করাতে আমারও যেন কেমন বাধো বাধো লাগতে লাগল। চিত্রাদের বাড়ির সঙ্গে আমাদের বাড়ির যে সম্পর্কটুকু ছিল আমি তার নাম দিয়েছিলাম অমিত্রাক্ষর ছন্দ। অভয়ের সঙ্গে চিত্রার যে মিল, তাতে তাও নেই। একে গদ্য কবিতাও বলা চলে না। তবে ব্যাপারটা কী। ওদের সম্পর্কটা কোন জাতের। নিজের জীবনের গিঁট বাঁধা গিঁট খোলার ফাঁকে ফাঁকে আমি ওদের কথা ভাবি।

"অভয়ের কথা মনে পড়ে। আমার জানালা থেকে, কি দোতালার ব্যালকনি থেকে, যখনই চিত্রাদের ঘরদোর চেখে পড়ত, অভয়কে প্রায় সব সময় কর্মব্যস্ত দেখতে পেতাম। কখনো বাজার থেকে ফিরছে, কখনো বা কয়লা ভাঙছে, জল তুলছে, রান্না করছে। আবার চিত্রা কি তার বাবা অসুখ-বিসুখে পড়লে তাঁদের সেবা শুশ্রূষা করছে। পথ্যের বাটী নিয়ে চিত্রাকে সাধাসাধি করছে দেখতে পেতাম। মাঝে-মাঝে মন্দ লাগত না দেখতে। মানুষ যখন কাজ করে, তার সেই নড়া চড়া থেকে যেন এক আলাদা ছন্দ আলাদা রূপ ফুটে বেরোয়। তাই বলে এ-কথা ভেব না যে, চিন্তামগ্ন মানুষের রূপ নেই। তাও আছে। আমি এক চোখা নই। ছু চোখ দিয়ে দেখি। তাই সব মানুষের মধ্যেই রূপ দেখতে পাই। এমন কি, পাপে মগ্ন মানুষও আমাকে টানে। ডুবন্ত জাহাজের মত তাদের মগ্ন সৌন্দর্য।

"দরকারী কাজ ছাড়া অভয়ের খুশির কাজও ছিল। টবে সে ফুলের চারা লাগাত। আমাদের মালীর কাছ থেকে সে অর্কিড, ডালিয়া, জিনিয়া, ক্যানার চারা চেয়ে নিত। চেয়ে নিত রঙ-বেরঙের গোলাপ। চিত্রার কি তার বাবার ফুলের দিকে কোন ঝোঁক ছিল না। তবে অভয়ের পুষ্পবিলাসকে কেউ বাধাও দেয়নি। আর ছিল ছেলে-মানুষের মত অভয়ের ঘুড়ি ওড়াবার শখ। যখন-তখন ছাদে উঠে মনের রং ও আকাশে উড়িয়ে দিত। শুধু নিজেই ওড়াত না, পাড়ার ছেলেদেরও অকাতরে নিজের তৈরী ঘুড়ি বিলাত। তার ফলে পাড়ায় ওর ভক্তের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। আর গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে বাঁশি বাজাত অভয়। কার কাছে যেন সবে শিখতে শুরু করেছিল। সব সময় যে সুর তাল ঠিক থাকত, তা নয়। তবু শুনতে নেহাত খারাপ লাগত না। আমি আমার ভাইবোনদের সঙ্গে মাঝে মাঝে এই নিয়ে হাসাহাসি করতাম। এই সব সাধ ওর কার জন্যে। আমার ছোটবোন বলত, 'দিদি নিশ্চয়ই তোমার জন্তে। ঠাকুর চাকর ত দূরের কথা, পৃথিবীর গাছ-পাথর পর্যন্ত তোমাকে চায়। তাদের যদি কথা বলবার শক্তি থাকত, বাঁশি বাজাবার শক্তি থাকত, চাওয়ার সুর এমনি শুনতে পেতে।'

"আমি হেসে বলতাম, 'তাহলে বাঁশির সুর এরই মধ্যে শুনতে শুরু করে দিয়েছিস তুই ? বাবাকে বলতে হবে কথাটা। কিন্তু অভয়ের রাধা যে ঘরের মধ্যেই বাঁধা ছিল এ-কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি।

"ওদের পালাবার কিছুদিন আগে বাড়িতে ছোটখাট এক অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কাকাবাবু বাড়ি ছিলেন না। উনুনে আঁচ দিয়ে অভয় যেন কাছেই কোথাই গেছে। তাকে ডাকাডাকি করে না পেয়ে চিত্রা নিজেই চায়ের জল গরম করবার জন্তে কেটলি হাতে রান্নাঘরে ঢুকেছিল। হঠাৎ কী করে আঁচল পড়ে গেল উনুনের মধ্যে। আর দাউ দাউ করে জলে উঠল আগুন। মেয়েদের আঁচলের লোভ কোন্ দেবতাই বা সামলাতে পারেন। অগ্নিই বল আর বরুণই বল।

চিত্রা যেমন নার্ভাস তেমনি বোকা মেয়ে। বি-এ পাশ করলে কী হবে, ওর মোটেই বুদ্ধিশুদ্ধি হয়নি। আগুনসুদ্ধু আঁচল নিয়ে ও ঘর আর বারান্দা দিয়ে কেবল ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। আর তার ফলে সে-আগুন ওকে একেবারে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। আগুনের ধর্মই ওই। ছুটোছুটি করে তাকে নেবান যায় না। তা ভিতরেরই হক, আর বাইরেরই হক।

"অভয় বেশী দূরে যায়নি। চিত্রার চেঁচামেচি শুনে সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হল। চিত্রাকে ধমক দিয়ে বলল, 'করছেন কী দিদিমণি? আপনার কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই? খুলে ফেলুন, শিগগির খুলে ফেলুন।'

"চিত্রা তবু বুঝতে পারছে না কী খুলবে।

"অভয় তখন এগিয়ে এসে টান দিয়ে ওর শাড়িটা খুলে ফেলল, টেনে ছিঁড়ে ফেলল সায়া আর ব্লাউজ। চিত্রা এক পলক বিমূঢ় হয়ে চেয়ে থেকে দু হাতে চোখ ঢেকে ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে দোরে খিল দিল।

"কয়েক বালতি জল এনে অভয় সেই জ্বলন্ত শাড়ি-ব্লাউজের উপর ঢেলে দিল। ততক্ষণে পাড়া-পড়শীরা সব এসে পড়েছে। কেউবা দূরে দাঁড়িয়ে রঙ্গ দেখছে। দু-এক জন বলল, "দমকল ডাকব নাকি অভয়?"

"কিন্তু ব্যাপারটা আর বেশী দূর গড়াল না। চিত্রাদের সবই রক্ষা পেয়েছে। ঘর-দোর চেয়ার-টেবিল বই-পত্র কিছুই পুড়ল না। পুড়ল শুধু চিত্রার কপাল। আর অভয়ের হাত। সে হাত জেনেশুনেই পুড়িয়েছে।

"কলকাতায় এসে এই অগ্নিকাণ্ডের তিনরকম ব্যাখ্যা আমি শুনেছি। একনম্বর হল ব্যাপারটা দৈব দুর্ঘটনা। দু নম্বর হল চিত্রা সাধ করে শাড়িতে আগুন ধরিয়েছে, অভয়ের হাতে ওর বস্ত্রহরণ হবে বলে। তিন নম্বরের টীকাকাররা বলল, হরণ যা

হবার হয়ে গিয়েছিল। গায়ে কেরোসিন ঢেলে চিত্রা গিয়েছিল মরতে। শেষ পর্যন্ত ভয়ের জন্যে পারেনি। বিশেষ করে অভয়ের জন্যে।

"যে ব্যাখ্যা তোমার পছন্দ হয় তাই বিশ্বাস কোরো। আমি তো তাই করি। বিশ্বাস অবিশ্বাস, ভালমন্দ, সুনীতি দুর্নীতি সব আমার পছন্দ অপছন্দের উপর।

"চিত্রা কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। গায়ে শুধু আগুনের আঁচ লাগেনি, পুড়েও গিয়েছিল দু এক জায়গা। ওই সঙ্গে জ্বরও হল। খানিকটা বোধ হয় আতঙ্কে। চিত্রার বাবা ডাক্তার ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু শুশ্রূষার ভার অভয় নিজের হাতে নিল। ওর সেই পোড়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত নিয়ে আগের মত, এমনকি আগের চেয়েও বেশী, কাজ ও করতে লাগল। ওর একখানা হাত পুড়ে গিয়ে যেন চারখানা হাত বেরিয়ে এসেছে।

"প্রথম প্রথম চিত্রা ওকে কাছে ঘেঁষতে দিত না। অভয় ঘরে গেলে তাকে সেখান থেকে চলে যেতে বলত। পাশ ফিরে শুয়ে থাকত, না হয় চোখ ঢেকে রাখত হাতের তেলোয়। কিন্তু অভয়ের আদর যত্নে অনুনয়-অনুযোগে কখনো বা শাসনে-ধমকে চিত্রা বিমুখ হয়ে থাকতে পারল না। ওষুধ খেল, পথ্য খেল, চোখ মেলল, মুখ তুলল।

"এদিকে পাড়াপড়শীরা গা-টেপাটিপি শুরু করেছে। আশে-পাশের বাড়িতে ছাদে জানালায় প্রায়ই নানাবয়সী বউ-ঝিরা এসে দাঁড়িয়ে থাকে। পুরুষের দলও যে না আসে তা নয়। আগে এই খ্রীস্টান বাড়িটি সম্বন্ধে পাড়ার কারো কৌতূহল ছিল না। কিন্তু এখন যেন পৃথিবীর যত রস যত রহস্য ওই পুরনো জীর্ণ বাড়িটির মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে।

"দিন কয়েক বাদে চিত্রা সুস্থ হয়ে উঠল। ওর বাবা গম্ভীর মুখে বললেন, 'এবার অভয়কে ছাড়িয়ে দিতে হবে।'

"চিত্রা বলল, 'কেন?'

"ওর বাবা বললেন, 'তোর ভালর জন্যে।'

"চিত্রা বলল, 'ভালমন্দ বোঝবার বয়স ত আমার হয়েছে বাবা।'

"চিত্রার বাবা বললেন, 'বয়স হলেই যে সবাই তার ভালমন্দ বুঝতে পারে এমন কোন কথা নেই।'

"চিত্রা বলল, 'এ কথা তোমার মুখে নতুন শুনছি বাবা। এতকাল ত তুমি আমাকে সেভাবে মানুষ করনি। তুমি আমাকে নিজের মনে থাকতে দিয়েছ। সব বিষয় সম্বন্ধে নিজের মতামত গড়ে তুলতে দিয়েছ। আজ কেন অন্য কথা বলছ? আজ কেন বাধা দিচ্ছ?'

"চিত্রার বাবা আবার বললেন, 'দিচ্ছি তোর ভালর জন্যে। তোর পরিণামের কথা ভেবে। একটা চাকরের সঙ্গে—ছি ছি ছি। ভাবতেও আমার গা ঘিনঘিন করছে। আমি তোর মুখের দিকে তাকাতে পারছিনে চিত্রা।'

"লজ্জায় চিত্রা নিজেও খানিকক্ষণ মুখ নিচু করে রইল। তারপর মুখ তুলে বাপের চোখের দিকে তাকিয়ে অসীম জেদ আর সাহসের সঙ্গে বলল, 'তুমি যা ভাবছ তা সত্যি নয় বাবা, লোকে যা বলছে তা মিথ্যে। আমি এমন কিছু করিনি, যাতে তোমার গা ঘিনঘিন করতে পারে। কিন্তু চাকর বলে ওকে ঘৃণা করবার অধিকার তোমার নেই।'

"চিত্রার বাবা বললেন, 'ঘৃণা ত আমি করছিনে। কিন্তু ও যা করে তাতে ওকে সমাদরও করতে পারিনে।'

"চিত্রা একটু হাসল, 'ও যা করে—। কিন্তু ওকে দিয়ে ত এসব কাজ আমরাই করাচ্ছি বাবা, আমরাই ওকে করতে বাধ্য করছি। শ্রমের মর্যাদা নিয়ে তুমি আর আমি কত আলোচনা করেছি, তুচ্ছ কাজে আজও হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষকে পেটের দায়ে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে আমরা দুজনে কত দুঃখ করেছি। মানুষের বুদ্ধি, চিন্তা কল্পনা, সৃষ্টিশক্তির এমন চরম অব্যবহার আর অপচয়ের জন্যে কত আফশোষ করে মরেছি। তুমি লিখেছ, আমি পড়েছি।

আর আমাদেরই চোখের সামনে ওই অভয় দিনের পর দিন বাসন মেজেছে আর জল টেনেছে।'

"চিত্রার বাবা বললেন, 'চিত্রা, এই জল টানা আর বাসন মাজার কাজ ত তুই শুধু আজ দেখলিনে। অনেককাল ধরেই ত দেখছিস। কিন্তু আজই তোর এই অবিচারটা কেন নতুন করে চোখে পড়ল। এত দরদ তোর মনের মধ্যে কেন উথলে উঠল। তার কারণ ওই লোকটাকে তুই অন্য চোখে দেখেছিস।' দাঁতে দাঁত পিষলেন তিনি। তারপর বললেন, 'কামনার চোখে দেখেছিস, লোভের চোখে দেখেছিস্। তাই তোর এই দরদের কোন দাম নেই। তোর এই ওকালতি নিঃস্বার্থ নয়।'

"চিত্রা ফের কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে চুপ করে রইল। তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'হয়ত তোমার কথাই ঠিক বাবা। হয়ত ভিন্ন চোখেই দেখেছি। আর তা দেখেছি বলেই এমন করে আমার চোখ খুলে গেছে। সামনে থেকে সব আড়াল সরে গেছে। বাবা, যাঁরা মহাপুরুষ মহামানব, তাঁরা এক সঙ্গে অনেককে দেখতে পান। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মুখ তাঁদের চোখের সামনে ভাসে। কোটি কোটি মানুষের দুঃখ সুখ তাঁদের হৃদয়কে দিনরাত তোলপাড় করে। কিন্তু আমরা যারা ছোট তারা জীবনে এমনি দুজন-একজনকেই শুধু দেখি। দুজন-একজনের ভিতর দিয়েই হঠাৎ একেক সময় আমাদের বিশ্ববোধ জাগে। শিশু কৃষ্ণের মুখে যশোদা যে বিশ্বরূপ দেখেছিলেন, সে-রূপ ছেলের মুখে ছিল না ছিল মায়ের চোখে।'

"হিন্দু পুরাণ, দর্শন, বাপ আর মেয়ে দুজনেরই চর্চার বিষয় ছিল। কিন্তু সেদিন মেয়ের মুখে এ-ধরনের পৌরাণিক উদাহরণ বাপের কাছে নিতান্ত হাস্যকর, অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক আর পরম অসহনীয় হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত আর না থাকতে পেরে তিনি তীব্র জ্বালাভরা স্বরে মুখ বিকৃত করে বললেন, 'কিন্তু তুই কি ভেবেছিস, একটা চাকরকে বিয়ে করে তুই দুনিয়ার চাকরের দুর্দশা ঘোচাতে পারবি? নাকি ঘরে

ঘরে মনিবের মেয়েরা ধরে ধরে চাকরদের বিয়ে করলেই সব শ্রেণীভেদ লোপ পাবে ?”

“চিত্রা বল্লে, ‘আমি ত পাগল হইনি বাবা যে ও কথা বলব। আমি শুধু আমার সমস্যার কথাই ভাবছি। শুধু আমার পথই খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছি।’

“ওর বাবা বললেন, ‘ও চেষ্টা তুই ছেড়ে দে চিত্রা। অভয়ের ওপর তোর যদি অত মায়া হয়ে থাকে, আমি ওকে পাঁচশ কি হাজার টাকা দিচ্ছি। তাই দিয়ে ও হয় লেখাপড়া শিখুক না হয় ব্যবসা-বাণিজ্য করুক। ওকে আগে মানুষ হতে দে। যাক আরো পাঁচ সাত দশ বছর। তারপর তোর যা খুশি তাই করিস।

“চিত্রা এবার কিছুক্ষণ ভেবে দেখল, তারপর বলল এর আগে তুমিই বলেছ বাবা, শুধু লেখাপড়া শেখাটা মানুষ হবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। আর ব্যবসা-বাণিজ্যে সিদ্ধি ? তাই কি মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড় মাপকাঠি ? বরং উল্টোটাই ত বেশী চোখে পড়ে। ওর সাধ্য নেই একা-একা কিছু করে। বেশী টাকা-পয়সা হাতে পড়লে ও হয়ত তা দুদিনেই নষ্ট করে দেবে। ওকে তোমার কিছুই দিয়ে কাজ নেই বাবা।’

চিত্রার বাবা বললেন, ‘বেশ, আমি ওকে কিছু দেব না। কিন্তু তুইও ওকে কিছু দিতে পারবিনে।’

“শুধু এ-কথা বলে তিনি নিশ্চিত আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না। অভয়কে সেই দিনই কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। পাড়ার ছেলেদের ডেকে বলে দিলেন, তাঁর চাকরের স্বভাব ভাল নয়। পয়সা চুরির অভ্যাস আছে। ঘরের জিনিসপত্র দিয়েও তাকে আর বিশ্বাস করা যায় না। তাই সে ফের যদি এমুখো হয় ত যেন উচিত শিক্ষা পেয়ে যায়।

“এসব কথা আমি চিত্রার মুখে পরে শুনেছিলাম। তার বাবা যে এসব কাজ করতে পারেন তা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু মেয়ের সুনাম আর পরিণামের চিন্তা আর সমাজে নিজের মান সম্মান খোয়াবার ভয়

তাঁকে বোধ হয় অস্থির আর অশান্ত করে তুলেছিল। অভয়কে তিনি বোধ হয় তখন নিজের হাতে খুনও করতে পারতেন। মানুষ যে কত বিচিত্র আর বিপরীত ধাতুতে গড়া তা আমার চেয়ে তোমারই বেশী জানবার কথা। একথা জানবার জন্যে পরের কাছে যাওয়ার দরকার হয় না। নিজের দিকে নিরাসক্তভাবে তাকালেই আমরা সেই দিব্যদৃষ্টি আর দিব্যজ্ঞান পেতে পারি।

"অভয় হত না হলেও খুবই আহত হল। একদিন বেশী রাত্রে পাড়ার ছেলেরা ওকে চোরের মার মারল যদিও জিনিসসুদ্ধ ধরতে পারলে না। পরদিন সে-জিনিস নিজে এসে ধরা দিল। চৌকিদারদের হাতে না, চোরের হাতে। ওরা পাড়া ছেড়ে পালাল। দিন কতক কেউ আর ওদের কোন পাত্তা পেল না।

"তুমি ত জান, পৃথিবীর রঙ্গালয়ে আমি শুধু দর্শক কি শ্রোতার সারিতে বসে থাকবার জন্যে আসিনি। নানারকম ভূমিকায় অভিনয় করেছি। হেসেছি, কেঁদেছি। সান্ত্বনা এই যে, কাঁদাতেও পেরেছি কাউকে কাউকে। আমার এই অতি-ব্যস্ত জীবনে যারা হারিয়ে যায়, তাদের পিছনে পিছনে যাবার আমার অভ্যাসও নেই, উৎসাহও নেই। তবু চিত্রার কথা আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ত। সামনের ওই ফ্ল্যাট-বাড়িটার ঘরগুলিতে অপরিচিত গৃহস্থ-বউদের নড়াচড়া আসা-যাওয়া দেখতে দেখতে একটি চেনা মুখ আমার চোখের সামনে ফুটে উঠত। আর সেই সঙ্গে ছেলেবেলার অনেক ছায়াছবি। ভাবতাম চিত্রা কেন আসে না এখানে? ওই বাড়িরই একটা ফ্ল্যাট নিয়ে কেন বাস করে না নতুন বেশে নতুন ধরনে? ও ত এখন নতুন জগতের বাসিন্দা। ওর ভয় কী? জানতে কৌতূহল হত, সেই লোকটি কি ওর সঙ্গে এখনো আছে, নাকি তাকে দুদিন বাদে তাড়িয়ে দিয়েছে চিত্রা? তাই ত স্বাভাবিক। তাহলে এখন কে ওর সঙ্গী, কেমন ওদের মধ্যে সম্বন্ধ, জানতে ইচ্ছে হত। কিন্তু সেই ইচ্ছাটা সক্রিয় হয়ে ওঠার আগেই আমি অন্য ক্রিয়াকর্মে জড়িয়ে পড়তাম।

"সেবার গোয়েন্দা-বিভাগের একটি চালাক চতুর সুদর্শন ছেলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হল। কথায় কথায় তাকে বললাম, 'তুমি আমার হয়ে একটা কাজ করতে পারবে ?' সে বলল, 'তোমার জন্যে অকাজও করতে পারি।' আমি ওকে দিলাম চিত্রার নাম-ধাম পরিচয়, রূপ-গুণের বর্ণনা। জানালাম সেই প্রণয়-কাহিনী তারপর বললাম, 'খুঁজে বার কর এই বনহরিণীকে। আমার ত মনে হয় এই শহরেরই কোন উপবনে সে আছে।'

"দিন কয়েক বাদে সত্যিই সে সন্ধান আনল। ডালহৌসী স্কোয়ারের এক বিদেশী মার্চেন্ট অফিসে চিত্রা স্টেনোগ্রাফারের চাকরি করছে। থাকে ইন্টালির এক সরু কানা গলিতে। নাম অনরেইট সেকেণ্ড লেন। আমার বন্ধু বলল, সেখানে আমাকে সে নিয়ে যেতে পারে। আমি ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, তাকে সঙ্গে করে গলিঘুঁজিতে হাঁটবার আমার ইচ্ছে নেই। বেড়াই ত বড় বড় সড়ক দিয়েই বেড়াব।

"আর একটু খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলাম চিত্রাকে শুধু আমিই দেখিনি। আমাদের পাড়ার অনেক ছেলেমেয়েরই তাকে চোখে পড়েছে। যারা ট্রামে-বাসে দশটা-পাঁচটার ভিড় ঠেলে অফিসে যায়, তারা দেখেছে শুকনো শীর্ণ স্বাস্থ্যহীন একটি মেয়েকে লেডীজ সীটের এক কোণে চুপ করে বসে থাকতে। কখনো বা সে বইয়ের মধ্যে ডুবে আছে। কখনো বা আপন ভাবনা সমুদ্রে। চিত্রাকে এ-পাড়ার অনেকেই চেনে। জিজ্ঞাসা করলে অনেকেই তারা আমাকে ওর খোঁজ এনে দিতে পারত। তার জন্যে গোয়েন্দা লাগাবার দরকার ছিল না।

চিত্রাদের যে পুরনো বাড়িটা রূপান্তর আর জন্মান্তর নিয়েছে, সেই বাড়ির তিন নম্বর ফ্ল্যাটের অনিলেন্দু সেন ইন্‌কামট্যাক্সের অফিসার। প্রথমে সে আমার বাবার কাছে আসত দরকারী কাজে। তারপর অদরকারেও আসতে লাগল। আমাদের ড্রয়িং-রুমে বসে গল্প করত। একদিন তার মুখেও শুনলাম চিত্রার কথা। চিত্রা নাকি আগে ওই অফিসেই কাজ করত। এমন কি, অনিলেন্দুরই সেকশনে। অনিলেন্দুর

ঠিকানা শুনে সে নাকি বলেছিল, আমরা আগে ওই বাড়িতেই থাকতাম।' আমার খোঁজ-খবরও জিজ্ঞাসা করেছিল চিত্রা। এমনি করে একসঙ্গে কাজ করতে করতে আলাপ-পরিচয় এগোয়। কিন্তু হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল। ছুটির পর অনিলেন্দু সেদিন অফিস থেকে বেরিয়েছে, পাশাপাশি চিত্রা চলছে হেঁটে। এমন সময় চোয়াড়ে চেহারার অশিক্ষিত অভদ্রদর্শন একটি লোক কোত্থেকে সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়াল, 'খুব যে জমিয়ে তুলেছ। আমার স্ত্রীর সঙ্গে অত খাতির কিসের তোমার? আমি কেবল দেখছি আর দেখছি। যেদিন ধরব, হাড় আর মাস আলাদা করে ছাড়ব।'

'চিত্রার মুখ বিবর্ণ। অনিলেন্দু অবাক। একটু বাদে সে বলল, 'মিসেস মণ্ডল, এই পাগলটি কে? একে কি আপনি সত্যিই চেনেন? নাকি পুলিস ডাকব?'

"চিত্রা বলল, 'পুলিস ডেকে দরকার নেই। ইনি আমার স্বামী। আসুন আলাপ করিয়ে দিই। অভয়কুমার মণ্ডল, আর—।"

"এতক্ষণ বিস্ময় ছিল, এবার বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠল অনিলেন্দুর। আলাপের উৎসাহ তার অনেক আগেই চলে গিয়েছিল।

"চার পাশে লোক জমতে শুরু করেছিল। চিত্রা তার স্বামীকে নিয়ে কোনরকমে একটা ট্রামে উঠে পড়ল। কিন্তু ঝামেলাটা একদিনেই গেল না। অভয় প্রায়ই এসে উৎপাত করতে লাগল। অনিলেন্দু খোঁজ-খবর নিয়ে আরো জানতে পারল যে, লোকটি আগে চিত্রাদের চাকর ছিল। এই রুচি-বিকৃতির কথা শুনে গা আরো রি রি করে উঠল অনিলেন্দুর। মেয়েটির শিক্ষা-সংস্কৃতির কোন মূল্যই তার কাছে আর রইল না। অফিসসুদ্ধ ছি-ছি-ছি পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত চিত্রা সেখান থেকে রিজাইন করতে বাধ্য হয়। এই অভিজ্ঞতা নাকি ওর প্রথম নয়। তবু যে বার বার কেন চাকরি করতে আসে, তাই আশ্চর্য।

"আমিও অবাক হলাম। অমন একটা ইতরকে চিত্রা আজও কেন সহ্য করছে? পৃথিবীতে সে কি আর দ্বিতীয় পুরুষ খুঁজে পেল না।

"তারপর খুঁজে খুঁজে একদিন গেলাম চিত্রার বাসায়। না, কোন গাড়ি নিলাম না, সঙ্গী নিলাম না। মনে কর না যে, সব সময় তোমাদের সঙ্গ আমার কাম্য। অচেনা-অজানা পথে একা একা বেড়াবার আমার অভ্যাস আছে। শুধু গাড়িঘোড়ায় নয়, খালি পায়েও হেঁটেছি। তার ফলে পথ হারিয়েছি বহুবার। আবার নিজেই নিজের পথ খুঁজে নিয়েছি।

"মার্কেটের সামনে ট্রাম থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে অনরেট লেনের সেই বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। তোমার ভাষায় সে এক দেশ আবিষ্কার। এ-গলিতে আমি এর আগে কোনদিন আসিনি। কলকাতায় কত অনাবিষ্কৃত গলিই যে আছে এখনো। শুধু ষ্ট্রীট-ডাইরেক্‌টরি দেখে তার চেহারা চেনা যায় না, রহস্য বোঝা যায় না, শুধু পা দিলে টের পাওয়া যায় গা কেমন শিরশির করে উঠছে।

"পুরনো দরিদ্রপাড়া। দু-দিকে ভাঙ্গা জীর্ণ বাড়ি। অন্ধকার অপরিচ্ছন্ন। নম্বর মিলিয়ে কড়া নাড়তেই সাত-আট বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে এসে দোর খুলে দিল।

"আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'খুকু, চিত্রা বলে এখানে কেউ থাকে ?'

"সে দোরের দুটি পাল্লা খুলে দিয়ে আমাকে সাদরে ভিতরে ডেকে বলল, 'ওই ত মাসী।'

"দেখি উঠোনের এক কোণে কলতলায় বসে বসে একটি মেয়ে বাসন মাজছে। পরনে লালপেড়ে আটপৌরে শাড়ি। এলো খোপাটি ঘাড়ের কাছে নোয়ানো। চেহারা অনেক রোগা হয়ে গেছে। তবু আমি ওর বসবার ভঙ্গি দেখে পিছন থেকে চিনতে পারলাম, ও চিত্রা ছাড়া আর কেউ নয়।

"সাড়া দিতেই ও মুখ ফেরাল। উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'তুই'!'

"আম জানি চিত্রা আমাকে পুরোপুরি ভালবাসত না, সহ্য করতে পারত না। কারণ ওর পথ আর আমার পথ এক নয়, ওর রুচি আর আমার রুচি আলাদা। তবু সেই মুহূর্তে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার আবছায়ায় আমরা দুজনেই অনুভব করলাম, আমরা দুই বন্ধু। অনেক দিনের অনেক কালের অনেক যুগের দুই পুরনো বন্ধু।

"চিত্রা বলল 'তুই এখানে আসবি আমি ভাবতেও পারিনি। গরিবের বাড়িতে হাতির পা।'

"আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হাতি তোকে পিঠে করে নিয়ে যেতে এসেছে। চল আমার সঙ্গে।'

"চিত্রা হাত ধুয়ে আমাকে সঙ্গে করে ওর ঘরে নিয়ে গেল। একতলায় তিন ঘর ভাড়াটে। দোতলায় থাকে একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবার। বারান্দা থেকে একটি বাঁধা কুকুরের ডাক মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল।

"চিত্রার ঘরখানা পূবদক্ষিণ কোণে। গিয়ে দেখলাম আসবাবপত্র সামান্যই। তবু ওরই মধ্যে বইয়ের র‍্যাক আছে। জানলার ধারে পাতা ছোট সস্তা দামের একটি টেবিল। চিত্রা আমার দিকে চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বোস।'

"বললাম, 'তুই কোথায় বসবি ?'

"ও বলল, 'আমি ত গৃহস্বামিনী।'

"হেসে বললাম, 'বটে! তা স্বামীটি কোথায়? তাকে যে দেখছিনে ?'

"চিত্রা বলল, 'কোথায় যেন বেরিয়েছে। একটু বাদেই আসবে হয়ত।'

"দু-চার মিনিট পরে চিত্রা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'তুই বোস। আমি চা করে আনি।'

"আমি হাত ধরে ওকে টেনে বসিয়ে বললাম, 'দরকার নেই চায়ের। আমি চা বেশি খাইনে। সেবার চা করতে গিয়ে তুই নাকি যা কাণ্ড ঘটিয়েছিলি। আমি সব শুনেছি।'

"চিত্রা একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'আজকাল আর সেসব হয় না। এখন আমি নিজের হাতে সব করি, সব পারি।'

"আমি বললাম, তা ত দেখতেই পেলাম। ইস্তক বাসন মাজা পর্যন্ত। তুই যখন আফিসে চাকরিবাকরি করিস অভয়কে দিয়ে ওসব কাজ করালেই পারিস। ওর ত অভ্যাসই আছে।'

"চিত্রা একটু হেসে বলল, 'থাকলে কী হবে। এখন আর করতে চায় না ভাই। এ-বাড়ির অন্য কোন পুরুষে ত করে না।'

"আমি বললাম, 'অন্য কোন পুরুষ আর ও কি সমান?'

"চিত্রা সে-কথার জবাব না দিয়ে আগের মতই হেসে বলল, 'বলে কি এতদিন ত আমি করেছি। এখন তুমি দিন কতক করে দেখ।'

"যেন কত বড় হাসির কথা। আমি রাগ করে বললাম, 'ব্রুট। চিত্রা, তুই ওকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে আরো অমানুষ করে তুলেছিস। আমি অনিলেন্দু সেনের কাছে সব শুনেছি। এত কাণ্ডের পরেও তুই ওকে সহ্য করছিস কী করে? ওর মনুষ্যত্ব ত গেছেই। তুইও তা খোয়াতে বসেছিস।'

"চিত্রা এ-কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'অনিলেন্দুবাবুর সঙ্গে তোর তা হলে আলাপ হয়েছে? তিনি বুঝি সব বলেছেন তোকে?'

"বললাম, 'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই বানিয়ে বলেননি।'

"চিত্রা স্বীকার করল। এক বিন্দুও বানায়নি অনিলেন্দু। তার সব কথা সত্যি। চিত্রাকে নানা জায়গায় এমন নিগ্রহ পেতে হয়েছে। যেখানেই ওর সত্য পরিচয় লোকে জানতে পেরেছে, সেখানেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অপমান-লাঞ্ছনা সয়ে সয়ে শেষ পর্যন্ত বিদায় নিতে হয়েছে ওকে। প্রাসাদের দিকে কোনদিন ও পা বাড়ায়নি। কিন্তু কুটিরে কুটিরেও দ্বার বন্ধ হয়েছে। সে সব কুটির চিত্রার মধ্যবিত্ত স্বজন-বন্ধুদের। তাদের শ্লীলতা, শালীনতা, রুচিবোধে চিত্রা আঘাত দিয়েছে। ওর এই রুচি-বিকৃতিকে কিছুতেই তারা মেনে নিতে পারেনি।

"বাইরের এই প্রতিকূল ছুনিয়ার বিবরণ শেষ করে চিত্রা বলল 'কিন্তু, রিনা, যুদ্ধ ত শুধু বাইরের সঙ্গেই নয়, যুদ্ধ ঘরের সঙ্গেও আছে। সেই যুদ্ধই সবচেয়ে বড়।'

"আমি রাগ করে বললাম, বড় না ছাই। আসলে তুই ওকে ভালবাসিসনি চিত্রা। ওই রকম একটা লোককে ভালবাসা যায় না। সাময়িক কৌতূহল হয়ত মেটান যায়। তুই ভালবেসেছিস একটা আইডিয়াকে। হয়ত তাও নয়। তুই ভালবেসেছিস নিজের জেদকে। তুই ভিতরে ভিতরে আমারই মত এক জেদী মেয়ে।'

"চিত্রা শান্তভাবে হেসে বলল, 'তবু ভাল, নিজের সঙ্গে আমার একটু মিল খুঁজে পেয়েছিস।'

"আমি বললাম, 'মিথ্যে কথা। তোর সঙ্গে আমার কোন মিল নেই। আমরা ছুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। আমি আমার প্রেমিকদের চাকর করে রেখেছি, আর তুই তোর চাকরকে প্রেমিক বানিয়েছিস, স্বামী বানিয়েছিস।'

"চিত্রা তেমনি হেসেই জিজ্ঞাসা করল, 'কোনটা ভাল রিনা, কোনটা ভাল?'

"আমি থমকে গেলাম। ওর আত্মপ্রত্যয় বড় বেশী। আমি চট করে জবাব দিতে পারলাম না। ও প্রত্যয়বাদী, আমি সংশয়ী। আমি কিছুকেই ধ্রুব বলে জানিনে, ধ্রুব বলে মানিনে। আমি নিত্য ভাঙি, নিত্য গড়ি। আর সেই ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাই। তোমাদের চোখে সেটা হয়ত থেমে পড়া, পিছিয়ে পড়া। তবু আমার ভাঙাগড়ার বিরাম নেই। আমি সব জিনিষ যাচাই করে করে নেব। কোন আপ্তবাক্য মেনে নেব না।

"চিত্রা বলতে লাগল, 'রিনা, কামার্ত পুরুষকে দাস করে রাখা যত সহজ, সেই দাসকে উঁচুতে তুলে আনা তত সহজ নয়। আমি ওকে রেজিস্টি করেই বিয়ে করেছি। কিন্তু সত্যিসত্যিই ওকে

প্রেমিকের পর্যায়ে স্বামীর পর্যায়ে তুলে আনা কি দুচার বছরের কাজ ?'

"আমি বললাম, 'কে তোকে বলে তুলে আনতে ? তুলতে তুলতে তুই যে একেবারে পটল তুলবি হতভাগী। রূপযৌবন খুইয়ে তুই যে বুড়ী হয়ে যাবি।'

"চিত্রা হেসে বলল, 'বুড়ী কি তুইই হবিনে ? ওকথা যাক। আমাদের সমাজে সমপর্যায়ের সমশিক্ষিত দুজন স্ত্রী-পুরুষ কি একরকম। বিশ্বাসে সংস্কারে মূল্যবোধে লাভ-লোকসান-সুবিধা-সুযোগের ভাগ-বাঁটোয়ারায় তাদের মধ্যে কত যে তফাত, কত যে হানাহানি, তা ত তুইও দেখেছিস। অভয় আর আমার মধ্যে ব্যবধান ত থাকবেই।'

"আমি বললাম, 'থাকবেই। তাহলে বল তোদের মিলটা গোঁজামিল। তোদের মিলটা শুধু দেহগত।'

"চিত্রা লজ্জিত হয়ে একটু কাল চুপ করে রইল, তারপর ফের মুখ তুলে বলল, 'না শুধু তাও নয়। তুই তোর বন্ধুদের মধ্যে কতকাল থেকে মনের মিল খুঁজে বেড়িয়েছিস। অল্পস্বল্প মিলে তোর তৃপ্তি নেই। যে মিল একান্ত মৌলিক, তাই তোর চাই। কিন্তু আমার কী ধারণা জানিস রিনা ? সে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সে গড়ে নিতে হয়। তুই যে মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছিস তাকে কোথাও পাবিনে, যদি তাকে নিজে না সৃষ্টি করে নিতে পারিস।'

"আমি হেসে উঠলাম 'সৃষ্টি করা? মানে যা নেই, সেই আকাশকুসুমে বিশ্বাস করা ? তা পারব না চিত্রা। আমি বরং ঘাস ফুল তুলে খোঁপায় গুজব, কোন ফুল না পেলে মাঝে মাঝে চোখে সর্ষেফুল দেখব, তবু সজ্ঞানে মাতাল হওয়ার আগে আকাশ-কুসুমের তত্ত্ব আওড়াব না। তোর সঙ্গে আমার বনল না। যাক ও-সব কথা ! কাকাবাবুর খবর কী, তাই বল। কেমন আছেন তিনি ? আছেন ত ?'

"চিত্রা বলল, আছেন। তিনি ছোটনাগ-পুরের এক মিশনারী কলেজে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন বাইরে। চিত্রা অনেক চিঠিপত্র লিখেছিল। ক্ষমা চেয়ে দেখা করতে চেয়েছিল। তিনি সে অনুমতি দেননি। আট দশ বছরের এক অনাথ সাঁওতালী মেয়েকে কুড়িয়ে নিয়ে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মনুষ করে তুলেছেন। আশা, সে হয়ত ভবিষ্যতে চিত্রার মত অবাধ্য হবে না। সে পিতৃস্নেহের দাম দেবে। মনে মনে হাসলাম। একজনের মানসকন্যা আর একজনের মানস-স্বামী। মানসপুত্রটি বোধ হয় আমার জন্যে বাকি রইল ।

"বাপের কথা তোলায় চিত্রার চোখ দুটি ভিজে উঠল। কথার ভিতর থেকে ঈর্ষার সূচও ফুটে বার হল। সেই একফোঁটা নাম-না-জানা সাঁওতালী মেয়েটার উপর হিংসা। চিত্রা বলল, 'সে বাবার সবখানি জুড়ে বসেছে। আমি এত করে লিখলাম, আপনি আমার কাছে এসে থাকুন, না হয় আমি আপনার কাছে যাই। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না! অথচ শুনি অসুখবিসুখে কেবলই ভোগেন। ওই মেয়েটা তাঁর কতটুকু সেবা-যত্ন করতে পারবে বলত রিনা?'

"আমি এ-কথার কোন জবাব না দিয়ে ফের অভয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। 'তার ভিতর থেকে কতখানি কী সৃষ্টি করতে পেরেছিস তাই শুনি। গেল কোথায়? নমুনাটা একবার দেখতে পারলে হত। ভাল কথা। সামনাসামনি নাম ধরে ডাকলে কি তার অপমান হবে? মিঃ মণ্ডল বলব, না অভয়বাবু? নাকি জামাইবাবু বলে ডাকলে তুই খুশী হবি সত্যি করে বল।'

"চিত্রা বলল, 'তোর কেবল ঠাট্টা। কেবল খোঁচা দিয়ে কথা বলার স্বভাব। তুই তাকে নাম ধরেই ডাকিস। হুকুম করিস পান সরবত এনে দিতে, আগে যেমন করতি। তোর কাছে ত আজও চাকর ছাড়া কিছু নয়।'

"আমি বললাম, 'তুই-ই বা এমন কোন মাথার মণি করে তুলেছিস? আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানিস। তোর ওই কানাকড়িটা কেড়ে ছুঁড়ে নর্দমায় ফেলে দিই। নইলে আসল মণির দিকে তোর চোখ পড়বে না।'

"চিত্রা হেসে বলল, 'তা তুই পারিস রিনা। সে শক্তি আছে। কিন্তু আসল মণি হল চোখের মণি। তার চেয়ে বড় মণি কী আছে আমি জানিনে।

"অভয়কে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা চিত্রা গোড়াতে করেছিল। বেশীদূর এগোয়নি। তারপর নানা কাজকর্মে ঢোকাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু অভয়ের মনে এক ধরণের ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স ঢুকে গেছে। বউয়ের চেয়ে ছোট কাজ অল্প মাইনের কাজ সে সহজে করতে চায় না। লোকে তাতে ঠাট্টা করবে। তার চেয়ে বউয়ের রোজগারে পায়ের উপর পা তুলে খাওয়া তার কাছে ঢের সম্মানের। কিন্তু চিত্রার তা মোটেই ইচ্ছা নয়। তার সম্মানবোধ স্বতন্ত্র। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই ঝগড়াঝাটি হয়। আভাসে-ইঙ্গিতে মনে হল, অভয় মারধরও এক আধটু করে। আবার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতেও দেরি করে না। পুরুষের স্বভাব সবজায়গায় একই রকম। চাকর মনিবে ভেদ নেই।

"তবু চিত্রা আশা ছাড়েনি। অভয়কে নিয়ে সে এক্সপেরিমেণ্ট করেই চলেছে। কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষাই যদি চালাবে, তাহলে একটা বাঁদরকে ধরে আনলে ত আরো সুবিধে হত। ছেলে মানুষ করা আর স্বামী মানুষ করা ত এক নয়; মেয়েকে বড় করা, আর স্ত্রীকে বাড়িয়ে তোলার কাজও আলাদা। স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুজনকে গড়বে। কিন্তু অত গোড়া থেকে নয়। তারা যখন শুরু করবে, তখন শুধু রঙের কাজ বাকি। মূর্তির একমেটের কাজ তার অনেক আগেই শেষ হয়েছে।

"তর্ক করলাম চিত্রার সঙ্গে। ওকে সহজে ছেড়ে দিলাম না। কেউ কেউ ভাঙ্গে তবু মচকায় না।। আমি আরো শক্ত ধাতুতে গড়া। আমি ভাঙিনে, মচকাইওনে।

"ওর কাছ থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছি, অভয় এসে হাজির হল। ওর হাতে থলি। বিকেলের বাজার সেরে এসেছে। আমাকে দেখে একটু হকচকিয়ে গেল। বলল, 'আপনি!'

"আমি, বললাম, 'হ্যাঁ, তোমাদের ঘরকন্না দেখতে এলাম। তোমাকে তুমি বলছি বলে কিছু মনে কর না। তুমিও আমাকে তুমি বলতে পার। তুমি এখন আমার বন্ধুর স্বামী।'

"আমার কথায় কতটুকু ঠাট্টা, কতটুকু আন্তরিকতা তা যাচাই করবার জন্যে অভয় একটু ভ্রূ কোঁচকাল। তারপর শুধু একটু হেসে থলি থেকে জিনিসগুলি বার করতে লাগল। লক্ষ্য করলাম, যা যা চিত্রা খেতে ভালবাসে, তার সবই থলিতে আছে। কই-মাছ, শাঁক আলু, মটরশুঁটি। সেই সঙ্গে এক শিশি মিক্শ্চার। আর একটা ফুড।

"অভয় বলল, 'মোটে ওষুধ খেতে চায় না। আপনি একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলে যান দিদিমণি। ওষুধপথ্য না খেলে শরীর ভাল হবে কী করে?'

"বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কী হয়েছে ওর?'

"অভয় বলল, 'শোনেননি বুঝি? এইত তিন মাস আগে একটা নষ্ট হয়ে গেল। সেই থেকে শরীরের আর আছে কী। আপনার কাছে বুঝি সব গোপন রেখেছে। ওই ত রোগ। কারো কাছে কিছু খুলে বলবে না। আচ্ছা, আপনিই বলুন ত, খুলে না বললে মানুষ কি মানুষের মনের মধ্যে সব সময় ঢুকতে পারে!'

"মনে মনে ভাবলাম এরা বোধ হয় তাহলে কোন কোন সময় পেরেছে। চিত্রা লজ্জিত হয়ে ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'যাক যাক, তোমাকে আর বকবক করতে হবে না।'

"ওরা আমাকে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়ল না। মোড় পর্যন্ত দুজনে এসে এগিয়ে দিল। রাস্তা থেকে একজন অনিচ্ছুক ট্যাক্সি-ওয়ালাকে প্রায় ধমকেই ডেকে আনল অভয়।

"আমি ট্যাকসিতে উঠে বসলাম। ভাবতে ভাবতে চললাম ওদের কথা। সেই সঙ্গে নিজের কথাও এল। ছেলেবেলা থেকেই আমার কেমন একটা ঝোঁক ছিল, আমি নতুন কিছু করব। দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানাব। হ্যাঁকে না, আর নাকে হ্যাঁ করে তুলব। কোন মেয়ের ছবি দেখলে কলমের ডগা দিয়ে আমি তার ঠোঁটে গোঁফ এঁকে দিতাম। পুরুষের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা আর চোখে কাজলের রেখা এঁকে তার মুখে নারীর কমনীয়তা আনতে চেষ্টা করতাম। আমাদের বাড়িতে বাবার তুলনায় মার ব্যক্তিত্বহীনতা দুঃখ-লাঞ্ছনা দেখে দেখে আমার ধারণা হয়ে গিয়েছিল, পৃথিবীতে মেয়েরা বড় বেশী মাত্রায় মেয়ে। তাদের আরো শক্ত হওয়া দরকার, তাদের মধ্যে আরো শক্তি আনা দরকার। পৃথিবীটাকে যে-অবস্থায় পেয়েছি, তাতে আমার সন্তোষ ছিল না। আমি কেবলই ভাবতাম, কী করে এর চেহারা পালটে দেওয়া যায়। কী করে সম্পূর্ণ মৌলিক হওয়া যায়। আমাকে তা হতেই হবে। তার জন্য যদি বিশ্বামিত্রের মত আজব দুনিয়া গড়তে হয়, তাও স্বীকার। চলতি ব্যবস্থাকে পদে পদে অস্বীকার করতে করতে আমি আস্তে আস্তে যে-পথ নিলাম দু দিন বাদে চেয়ে দেখি সে-পথও পুরনো। সে-পথেও হাজার হাজার মানুষের পায়ের দাগ। সেখানেও পিছলে পড়ে হুমড়ি খাওয়ার ইতিহাস। ভেব না আমি অনুশোচনা থেকে এ-কথা বলছি। অনুতাপের অশ্রুও আমার চোখে আসেনি। কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে সব পথই যদি পুরনো, তাহলে নতুন কী। অথচ পৃথিবীটা সত্যি সত্যিই সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মার্কেটের জিনিস, এখানে নতুন কিছু বলবার নেই, করবার নেই, এ-কথা মানতেও মন বিদ্রোহ করে। কারণ আমার পাঁচ ইন্দ্রিয়ের এখনো কিছুই অসাড় হয়নি। আমি এখনো পৃথিবার নতুন স্বাদ পাচ্ছি, নতুন দৃশ্য দেখছি, নতুন স্পর্শ পাচ্ছি সর্বাঙ্গে। রোজ সে নতুন করে জন্মাচ্ছে, পুরনো বাপ মায়ের ভিতর থেকে নতুন শিশু বেরিয়ে আসছে। না,

দুনিয়াটা যে পুরনো আর বাসী এ-কথা মানব না কল্যাণ। বাসী দুনিয়ায় আমি বাস করব না।"

আমি হেসে বললাম, "তোমাকে বাস করতে বলে কে?"

রিনা বলতে লাগল, "চিত্রার কথা ভাবতে ভাবতে এলাম। ওকে পুরনো বলে একেবারে বাতিল করে দিতে পারিনে। কারণ ও ঠিক আমার মা-মাসীদের মত নয়। আবার ওকে স্বীকার করতেও আমার মন বাধা পায়। কারণ ওই ত্যাগ, ওই দুঃখবরণ, যৌবনরসের ওই অপচয় আমার জন্যে নয়। ও দয়া করতে চায় করুক, অনুকম্পা দেখাতে চায় দেখাক। কিন্তু স্বামী কি প্রেমিকের মধ্যে আমি চাই সখাকে, বন্ধুকে। যদি একজনের মধ্যে তাকে না পাই দশজনের ভিতর থেকে তাকে খুঁজে নেব। যদি অখণ্ডভাবে তাকে না পাই, তিল তিল করে গড়ে তুলব সেই তিলোত্তমাকে। যদি সে স্থায়ী না হয়, আমিও হব ক্ষণিকা।"

একটুক্ষণ চুপ করে রইল রিনা। তারপর বলল, "বছর দেড়েক বাদে আজ আবার দেখা হল চিত্রার সঙ্গে। এতকাল পরে ও নিজেই সাহস করে এসেছিল আমার এখানে। তুমি যে-চেয়ারটায় বসেছ, ওই চেয়ারে বসে সুখ-দুঃখের অনেক কথা সে বলল। শরীরটা আগের চেয়ে সেরেছে। চিত্রা সেই মার্চেণ্ট অফিসের চাকরিও ছেড়ে দিয়েছে। মার্কেটের কাছে ছোট একটা ঘর নিয়ে তাতে খুলেছে এক দোকান। এক দিকে দর্জিখানা, আর একদিকে লণ্ড্রি। দুজনে একসঙ্গে সেখানে বসেছে। সেলাই ফোঁড়াই, আড়ং ধোলাইয়ের ব্যবসা চালাবার মত বিদ্যা চিত্রা নাকি এর মধ্যে কিছু কিছু শিখে নিয়েছে। এতে আপাতত অভয়েরও খুব উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। চিত্রা অনেক ভেবে দেখেছে, অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছে, অভয়ের সহকর্মী হওয়া ছাড়া ওকে কাজে লাগাবার আর কোন পথ নেই।

"যেন সহকর্মী হলেই সহমর্মী হয়। যেন স্ত্রী-পুরুষ দুনিয়ায় একসঙ্গে এই প্রথম কাজ করছে। মানে, সভ্য শিক্ষিত জগতের সঙ্গে চিত্রার যেটুকু সম্পর্ক ছিল, তাও গেল।

"চিত্রা বসেছে বলে দোকানে কিন্তু বেশ ভিড় হচ্ছে। লোকে আড়ালে আবডালে ঠাট্টা-তামাশা করছে, কিন্তু ভিড় করতেও ছাড়ছে না। অভয় দোকানের নাম দিয়েছে নবরূপা। কার মুখ থেকে কথাটা শুনেছে কে জানে। চিত্রা আপত্তি করেনি। কোন কিছুতে আপত্তি করতে কি ও জানে যে করবে?

"কাল নাকি ওদের সেই নবরূপার ঘটা করে উদ্বোধন, মানে জানাশোনা কয়েকজনকে বলবে। জাঁকজমক কোনকালেই চিত্রা পছন্দ করত না আজও করে না। তেমন শক্তিই বা কই।

"গোপনে আমাকে আরো একটা কথা বলে গেল চিত্রা। কাল ওদের বিবাহবার্ষিকী। এতকাল কিছু করেনি। পাঁচ বছর পরে এই প্রথম নাকি সেই দিনটির কথা চিত্রার আজ মনে পড়েছে।

"সেই থেকে ভাবছি ওদের কথা। নতুন আর পুরনোর কথা। ওরা যা করছে তা নতুন নিশ্চয়ই নয়। হয়ত এর মধ্যেও একদিন জোড়াতালি ধরা পড়বে। নবরূপার নবত্বও যাবে, রূপও থাকবে না। আমি দুনিয়াটাকে অত সরল সহজ বলে ভাবিনে। এক কথায় সমাধান টেনে দিতে পারিনে। আমার কাছে চিত্রার চার্ম এই জন্যে কম যে, ওর মধ্যে জটিলতা নেই। ও সব সময় কিছু পেতে চায়, পেয়েছি বলে ভাবতে চায়। আর আমার সন্ধানের মধ্যেই পাওয়া, সাধনার মধ্যেই সিদ্ধি। তবু ওর মধ্যে আজ এক নতুন উৎসাহ দেখলাম কল্যাণ। চোখেমুখে যেন এক নতুন রঙ ফুটে বেরিয়েছে। স্বাস্থ্যটা ভাল হয়েছে বলেই হয়ত।

"রঙ। এই রঙেই কি পৃথিবীর রূপ বদলায়? সে বারবার পুরনো থেকে নতুন হয়ে ওঠে? আর শিল্পীর তুলিতে যা রঙ, নীতিবিদের মুখে তার নামই কি মূল্য?"

রিনা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটু হেসে বলল, "এখন ভেবে দেখ, চিত্রার সঙ্গে আলাপ করবে কি না।"

ঔদাসীন্যের ভঙ্গি করে বললাম, "এমন কিছু তাড়া নেই। পরে কোন এক দিন যদি আলাপ করি তোমার জন্যেই করব।"

রিনা ভ্রূ কুঁচকে বললে, "তার মানে?" বললাম, "মানে আজ যেমন তোমার চোখে তাকে দেখলাম, তেমনি আর একদিন তার চোখে তোমাকে দেখব, তার মুখে শুনব তোমার কথা।"

রিনা হেসে উঠে বলল, "তাহলে কিন্তু তোমাকে হতাশ হতে হবে। সে বেশী কথা বলতে জানে না।"